বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্ম ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮ প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯ কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০ বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩ বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬ প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮ অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭ ভারতের বনৌষধি : ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

উপনিষদ্

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

চৈত্র, ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস, ২৭।৩ বি হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা

পুরুষসিংহ

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহোদয়েষু

নিবেদন

সাধারণ বাঙালী পাঠকেরা যাহাতে সহজ কথায় বিবিধ বিষয়ের একটা পরিচয় পাইতে পারেন তাহারই চেষ্টা করা হইতেছে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য, ইহাই আমি শুনিয়াছিলাম, মনে হইতেছে। তদনুসারেই পরের কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহা বিশেষজ্ঞদের জন্য নহে। ইতি

"ব্রহ্মবিহার"
কলিকাতা
২৩ চৈত্র, ১৩৫৩

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে বেদকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড।[1] কিন্তু এই দুই নামে কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই। বৈদিক যে কোনো গ্রন্থে বা তাহার অংশবিশেষে কর্ম ও জ্ঞানের আলোচনা আছে তাহাকেই যথাক্রমে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়।

কী উপায়ে পরম কল্যাণ হইতে পারে ইহা অপেক্ষা আর কোনো গুরুতর প্রশ্ন মানবের নাই, এবং ইহার সমাধানের চেষ্টা সে বরাবর করিয়া আসিয়াছে, করিতেছে এবং পরেও করিবে।

ভারতে এ বিষয়ে কী চিন্তা হইয়াছে তাহা আমরা প্রথমে বেদে দেখিতে পাই। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋষিগণ মনে করিতেছেন

---

১ সমগ্র গ্রন্থকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশকে বৃক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বা তদাশ্রিত লতার নামে উল্লেখ করা আমাদের দেশের প্রাচীন পদ্ধতি। কাণ্ড শব্দে গাছের গুঁড়িকে বুঝায়। শতপথব্রাহ্মণের ১৪টি প্রধান ভাগের এক-একটির নাম কাণ্ড, এবং তদন্তর্গত ছোট-ছোট অংশকে কণ্ডিকা (বা কাণ্ডিকা) বলা হইয়া থাকে। রামায়ণের প্রধান সাতটি ভাগের এক-একটির নাম কাণ্ড, যেমন বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, ইত্যাদি। মূল দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের এক-একটি ভাগ স্কন্ধ নামে সুপ্রসিদ্ধ। গ্রন্থের এক-একখানি পৃষ্ঠাকে পত্র বা পাতা বলা হইয়া থাকে। হয়তো উহা তাল প্রভৃতির পাতায় লেখা হইত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। অথবা পূর্বোক্ত অংশবিশেষের কল্পনা হইতেও ইহা হইতে পারে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক-একটি মূল পরিচ্ছেদকে বল্লী অর্থাৎ লতা বলা হয়, যেমন শিক্ষা-বল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী। কঠ উপনিষদের এক-একটি অধ্যায় দুই-দুই বল্লীতে বিভক্ত।

যে, যাগ-যজ্ঞ কর্মের অনুষ্ঠানে ঐ কল্যাণ লাভ করা যায়। তাঁহারা সোমযাগ করিতেন, আর মনে করিতেন আমরা অমর হইয়াছি। তাঁহারা এইরূপ বহু যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। ক্রমে তাঁহাদের চিন্তার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয়। কিছু-না-কিছু কামনা করিয়াই তাঁহারা যাগ-যজ্ঞ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহ-কেহ দেখিলেন, উহাতে উত্তরোত্তর কামনার বৃদ্ধি হয় বৈ হ্রাস হয় না, এবং এইজন্য তাহাতে দুঃখেরও অবসান হয় না, শান্তিও আসে না। কেহ-কেহ ভাবিলেন, কৃষিকর্মের ফল যেমন অস্থায়ী, বেদোক্ত কর্মেরও ফল তেমনি অস্থায়ী। কেহ-কেহ মনে করিলেন, ভেলায় যেমন সমুদ্রের পারে যাওয়া যায় না, তেমনি কর্মের দ্বারা সংসারের দুঃখ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, বেদোক্ত কর্মের দ্বারা মানবের শেষ প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না। আবার অনেক বৈদিক কর্মে পশুহিংসা থাকায় অনেককেই তাহা ভাল লাগিল না। তাঁহারা তাহা কিছুতেই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এইরূপ মনে করিয়া কেহ-কেহ মানবের কল্যাণ অন্য প্রকারে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহারা ভাবিলেন, ইহা জ্ঞানেরই দ্বারা হইতে পারে, কর্মের দ্বারা নহে। এই জ্ঞানবাদীদেরই উক্তি স্থান পাইয়াছে জ্ঞানকাণ্ডে। আমাদের উপনিষদ্ এই জ্ঞানকাণ্ডেরই অন্তর্গত।

আরো একপ্রকারে বেদকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যে ভাগে যজ্ঞ প্রভৃতি কার্যে প্রযোজ্য কেবল মন্ত্রগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা মন্ত্র। ইহারই অপর নাম সংহিতা। যেমন ঋগ্বেদ-সংহিতা বা ঋক্-সংহিতা, যজুর্বেদ-সংহিতা বা যজুঃসংহিতা, ইত্যাদি। আর যে ভাগে যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ ও মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে,

তাহার নাম ব্রাহ্মণ। এক হিসাবে ইহাকে বেদের আদিম ব্যাখ্যা বা বিবরণ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম (ন্) শব্দের মানে এখানে বেদ। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ইহা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই আলোচনা আছে। ইহার যে অংশে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সাংকেতিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে, তাহাকে আরণ্যক বলা হয়, কেননা ইহা অরণ্যে অর্থাৎ বনে পাঠ করা হইত, কারণ, এইসব কথা দুরূহ বলিয়া যেখানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে শেখান হইত না, এবং ইহা অবধারণ করিবার জন্য অতি নির্জন স্থান আবশ্যক হইত। আমাদের বহু উপনিষদ্ এই আরণ্যকের অন্তর্গত। কেবল একখানি মাত্র উপনিষদ্ মন্ত্র বা সংহিতার মধ্যে। ইহার নাম ঈশোপনিষদ্। ইহা হইতেছে শুক্ল যজুর্বেদের শেষ (অর্থাৎ ৪০শ) অধ্যায়।

উপনিষদেরই অপর নাম বেদান্ত (বেদ-অন্ত)। যেহেতু ইহা বেদের শেষ অর্থাৎ কর্ম- ও জ্ঞান-কাণ্ডের মধ্যে শেষ জ্ঞান-কাণ্ডের অন্তর্গত। অথবা কাহারো কাহারো মতে, বেদের শেষ লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত ইহাতে সংগৃহীত, সেইজন্য ইহা বেদান্ত।

উপনিষদ্‌কে কেন উপনিষদ্ বলা হয় এ প্রশ্ন সহজেই এখানে উত্থিত হইবে। প্রাচীন আচার্যগণ ইহার ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথা বলেন যে, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া ("উপ-") নিশ্চয়ের সহিত ("নি-") ইহার অনুশীলন করেন, ইহা তাঁহাদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিনাশ করে ("√সদ্") এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ্।

নবীনগণের চিন্তার ধারা অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, যেখানে লোকেরা চারিদিকে ("পরি-") বসে ("√সদ্") তাহাকে আমরা বলি

পরিষদ্। এইরূপ লোকেরা যেখানে একসঙ্গে ("সম্-") বসে ("√সদ্") তাহাকে বলা হয় সংসদ্। ঠিক এইরূপেই শিষ্যেরা গুরুর নিকটে ("উপ") গিয়া যেখানে বসিতেন ("নি-√সদ্") মূলত সেই ছোট-ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ্। কালক্রমে এইসব উপনিষদে বা বৈঠকে যে বিদ্যার (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার) আলোচনা হইত তাহারও নাম হইল উপনিষদ্। ইহার পরে যে গ্রন্থে এই বিদ্যা লিপিবদ্ধ হইল তাহাকেও উপনিষদ্ বলা হয়।

উপনিষদ্ শব্দের আর একটি অর্থ হইতেছে 'রহস্য'। অতি গম্ভীর ও দুর্গম বলিয়া এই উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় নির্বিচারে যেখানে-সেখানে সকলের নিকট প্রকাশ করা হইত না বলিয়া ইহা ছিল রহস্য। এইজন্য উপনিষদ্ ও রহস্য এই দুইটি শব্দ একার্থক হইয়া পড়ে। উপনিষদ্ যে কত রহস্য ছিল তাহা ইহা হইতেই জানা যাইবে যে, পৃথিবীরাজ্য দান করিলেও অতিপ্রিয় শিষ্য বা জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন আর কাহাকেও ইহা দান করা হইত না।

পূর্বে উপনিষদগুলি সেই সেই মূল গ্রন্থেরই মধ্যে থাকিত। সম্প্রতি পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য এগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া প্রকাশ করা হয়।

ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব এই চারি বেদেরই উপনিষদ্ আছে। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনোটি ঐ ঐ বেদের ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের মধ্যে। যেমন ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয় আরণ্যকের মধ্যে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মধ্যে। কেন উপনিষদ্ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোনো কোনো উপনিষদের বেদের সঙ্গে এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কোনো-না-কোনোরূপে পরম্পরা, সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করা হয়। যেমন অথর্ববেদের সহিত মুণ্ডক ও প্রশ্ন

উপনিষদের।[১] কিন্তু এমনও উপনিষদ্ আছে যাহার সঙ্গে বেদের অর্থাৎ তাহার মন্ত্র বা ব্রাহ্মণের অথবা তাহার অন্য কিছুরও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নাই।

প্রাচীন উপনিষদের গৌরব এতই হইয়াছিল যে, পরবর্তী কালে অনেকে উপনিষদের অনুকরণে লিখিত নিজ-নিজ গ্রন্থকে ঐ নামেই চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপে শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহু সাম্প্রদায়িক উপনিষদের উদ্ভব হইয়াছে। যোগ, সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয়েও অনেক উপনিষদ্ হইয়াছে।[২] যাহার সহিত উপনিষদ্ বা বেদান্তের কোনো সম্বন্ধই নাই এমন পুস্তকও উপনিষদ্ নামে চলিয়াছে। যেমন বজ্র-সূচিকা উপনিষদ্। ইহাতে উপনিষদের নাম-গন্ধও নাই, তথাপি ইহা উপনিষদ্ নামে চলে। ইহাতে আছে জাতিবাদের খণ্ডন।[৩] এইরূপে উপনিষদের সংখ্যা এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে বলিবার নহে। অন্তত ইহা দুই শতের কম হইবে না। এই জাতীয় উপনিষদের একখানির নাম অল্লোপনিষদ্। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইহা ইসলাম ধর্মের অনুকূলে

---

১ মুণ্ডক উপনিষদের ২.২.১ সংখ্যক মন্ত্রটি অথর্ববেদের ১০.৭.৮ হইতে গৃহীত। প্রশ্নোপনিষদের প্রশ্নগুলির সমাধান করিয়াছিলেন ঋষি পিপ্পলাদ। ইনি ছিলেন অথর্ববেদের পিপ্পলাদ শাখার প্রতিষ্ঠাতা। অতএব এই উপনিষদ্ দুইখানি অথর্ববেদের ইহা বলিতে পারা যায়। এইরূপ অন্যত্র।

২ মাদ্রাজের আডিয়ার লাইব্রেরী হইতে এইরূপ অনেক উপনিষদের বেশ ভাল সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

৩ এই নামে আর একখানি পুস্তিকা আছে। ইহারও প্রতিপাদ্য বিষয় জাতিবাদের খণ্ডন। বলা হয়, ইহা অশ্বঘোষের রচিত। ইহার চীনা অনুবাদ আছে। বিশ্বভারতী হইতে ইহার একটি ভাল সংস্করণ বাহির হইবার কথা আছে।

লিখিত।[1] ঠিক এইরূপেই কোনো এক পাদরী নিজে তত্ত্ববোধ স্বামী নাম লইয়া খৃষ্টধর্মের অনুকূলে এজুর্বেদ নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন।

উপনিষদ্গুলির মধ্যে কতক প্রাচীন, কতক বা পরবর্তী। ভাষা, রচনার রীতি ও আলোচ্য বিষয় প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিলে কোনখানি উপনিষদ্ প্রাচীন ও কোনখানি পরবর্তী, ইহা বুঝা শক্ত হয় না। এইরূপ উহাদের মধ্যে কতক বড়, কতক বা ছোট; কতক পদ্যে, কতক বা গদ্যে, আবার কতক বা গদ্য ও পদ্য উভয়েই রচিত।

আমরা এখানে প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ কয়েকখানি মাত্র উপনিষদের নাম ও অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি—

১। ঈশা। "ঈশা" (অর্থাৎ 'ঈশ্বরের দ্বারা') এই কথাটি আরম্ভেই থাকায় ইহার এই নাম। ইহা শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ি-সংহিতার শেষ (৪০শ) অধ্যায়। এইজন্য ইহাকে সংহিতোপনিষদ্ও বলা হয়। ইহা খুব ছোট ও দুইটি মন্ত্র ছাড়া সবই পদ্যে রচিত।

২। কেন। "কেন" (অর্থাৎ 'কাহার দ্বারা') শব্দটি আরম্ভে থাকায় ইহার এই নাম। ইহা সামবেদের জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের একটি (১০ম) পরিচ্ছেদ। ইহাও খুব ছোট। ইহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

৩। কঠ। কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠশাখার সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকায় ইহার এই নাম। ইহা পদ্যে রচিত।

৪। প্রশ্ন। ইহাতে ছয়টি প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে, এবং

---

১ ইহা ১৭ শতকে সাজাহানের পুত্র দারা শিকো রচনা করাইয়াছিলেন। একটু নমুনা দিতেছি। ইহার আদি হইতেছে "অস্মল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণৌ" ইত্যাদি; অন্ত হইতেছে "হুঁ অল্লো রসুল মহম্মদরকং বরস্য অল্লো" ইত্যাদি। "ইত্যাথর্বণসূক্তম।" ইহা শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত দেখা যাইবে।

সেই জন্যই এই নাম। ইহার সম্বন্ধ অথর্ববেদের সহিত। ইহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

৫। মুণ্ডক। ইহার এই নাম কেন হইয়াছে ঠিক বলা যায় না। তবে ইহাতেই (৩-২-১০) বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি যথাবিধি 'শিরোব্রত' করে, তাহাকেই ইহাতে আলোচিত ব্রহ্মবিদ্যা দান করিতে পারা যায়। ইহাতে মনে হয় শির অর্থাৎ মুণ্ডের ব্রতের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় ইহার এই নাম। মুণ্ড ও মুণ্ডক একই। 'শিরোব্রত' একটি অনুষ্ঠান। ইহাতে মাথায় অগ্নিধারণ করিতে হয়। ইহাতেও গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

৬। মাণ্ডূক্য। মধ্বাচার্যের মতে বলা যায়, মণ্ডূক ঋষি ইহা প্রকাশ করেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

৭। তৈত্তিরীয়। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের যে অংশকে তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলা হয়, ইহা তাহারই অন্তর্গত বলিয়া এই নাম। ইহা গদ্যে রচিত।

৮। ঐতরেয়। ইহা ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত, তাই ইহার এই নাম। ইহাও গদ্যে রচিত।

৯। ছান্দোগ্য। ছান্দোগ্য বা সামবেদের ব্রাহ্মণের (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের?) প্রথম অংশ আরণ্যক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই উপনিষদ্‌খানি ইহারই অন্তর্গত বলিয়া এই নাম। ইহা বেশ বড়। ইহা গদ্যে রচিত, তবে মধ্যে মধ্যে দুই-একটি পদ্যও আছে।

১০। বৃহদারণ্যক। শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শতপথ ব্রাহ্মণের এক অংশকে আরণ্যক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহারই শেষ ভাগ উপনিষদ্। ইহা আকারে বৃহৎ এবং মূলত আরণ্যক বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহা গদ্যে, তবে মধ্যে মধ্যে পদ্যও আছে।

১১। কৌষীতকি। ঋগ্বেদেরই অন্য একখানি ব্রাহ্মণের নাম কৌষীতকি ব্রাহ্মণ। কৌষীতকি আরণ্যক ইহারই অন্তর্গত, এবং এই আরণ্যকের একটি অংশ কৌষীতকি উপনিষদ্।

১২। শ্বেতাশ্বতর। কৃষ্ণযজুর্বেদের শ্বেতাশ্বতর শাখার সহিত সম্বন্ধ থাকায় ইহার এই নাম। ইহা সমগ্রই পদ্যে।

১৩। মৈত্রায়ণী। কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়ণী শাখার অন্তর্গত বলিয়া ইহার এই নাম। ইহাকে মৈত্রী উপনিষদ্ও বলা হয়। তবে এই নামে আর একখানি উপনিষদ্ আছে। ইহা গদ্যেই রচিত, তবে মধ্যে মধ্যে পদ্যও আছে।

দশোপনিষদ্ কথাটি খুবই প্রচলিত। ইহা বলিতে উল্লিখিত প্রথম দশখানি উপনিষদ্ বুঝায়।

এখানে কেবল এই কয়খানি মাত্র উপনিষদের নাম করায় কেহ যেন মনে না করেন যে, অবশিষ্ট উপনিষদ্গুলির সবই অকেজো, তাহাদের মধ্যে তেমন কিছুই আলোচ্য নাই। ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। কেননা খুব ছোট বা খুব পরবর্তী হইলেও ইহাদের কোনো কোনোখানির মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কথা বা চিন্তা আছে। কোনো কোনো প্রাচীন চিন্তার ক্রমপরিবর্তন বা বিকাশ, অথবা কোনো উপাদেয় ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, অথবা কোনো কোনো নূতন কথাও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। উপাসনা ও সাধনার সম্বন্ধেও অনেক বিষয় জানা যায়। অতএব জিজ্ঞাসু পাঠকগণের নিকট এগুলি উপেক্ষণীয় নহে।

উপনিষদের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে সমগ্র মানবের প্রথম ও প্রধান কথা, আর তাহা হইতেছে তাহার আত্মাকে বা নিজেকে লইয়া। সে যদি নিজে থাকে তবে তাহার কাছে অন্য কিছু থাকিতে পারে। অন্যথা তাহার কাছে কিছু থাকা আর না-থাকা সমান। তাই তাহার

নিকট প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে তাহার টিকিয়া থাকিবার, এবং ভালরূপে টিকিয়া থাকিবার কথা। এই আমি আছি, ইহার পর আর থাকিব না, এ চিন্তা সে সহিতে পারে না। সে চায়, যে রকমে হউক তাহাকে থাকিতেই হইবে। মৃত্যু তাহার আসে। শরীর তাহার যায়। কিন্তু সেও কি শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে যায়, নষ্ট হয়? মরণ হইলে তাহার সবই শেষ হয়, না কিছু থাকে? থাকিলে কী থাকে? কোথায় থাকে? কোথা হইতে সে আসিল? কোথায় বা যাইবে? এই চারিদিকে যা কিছু দেখা যাইতেছে, কী করিয়া এ সব হইল? কে এ সব করিল? কে বা এ সবকে যথাযথভাবে ঠিক করিয়া রাখে? কেই বা এগুলিকে কালে ধ্বংস করে? নিজেই বা সে কে? এই কি দেহ-মাত্র? দুঃখ তাহার আসে, সুখও আসে, কোথা হইতে? কে দেয়? কীরূপে? কেন? দুঃখের, অশান্তির তো তাহার ইয়ত্তা নাই। কীরূপে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? পরম সম্পদ্, পরম আনন্দ, পরম শান্তি কী পাওয়া যায়? গেলে তাহার উপায় কী? এই এবং এইরূপ আরো কত অজানা রাজ্যের প্রশ্ন তাহার নিকটে উপস্থিত হয়, আর সে যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি চিন্তা করিয়া তাহার উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে। ইহা না করিয়া সে পারে না। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা এইসব বিষয়ে কীরূপ কী চিন্তা করিয়াছেন তাহা প্রধানত উপনিষদ্গুলিরই মধ্যে পাওয়া যায়। উপনিষদেই আত্মার সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব, জ্ঞান বা বিদ্যা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে। আত্মবিদ্যারই অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা, কেননা আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হয়। কেন বলা হয় তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। আর এই ব্রহ্ম-বিদ্যাকেই পরা বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। উপনিষদে বলা হইয়াছে বিদ্যা দুই রকমের, অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট, আর পরা অর্থাৎ

উৎকৃষ্ট। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, ইত্যাদি বিদ্যার নাম অপরা বিদ্যা, আর যাহা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ নিত্য বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায় তাহার নাম পরা বিদ্যা। উপনিষদে ইহাই আমরা পাই।

ইহা গম্ভীর, অথচ অতি উপাদেয়। ইহার তুলনা হয় না। ভারতের সমস্ত উচ্চ ধর্মের মূল ইহাতেই। বাহিরের আকারে ভারতীয় ধর্মগুলির মত যতই ভিন্ন হউক, ইহাদের সমর্থক ধর্মশাস্ত্রগুলি, সংস্কৃত, প্রাকৃত বা প্রাদেশিক ভাষাগুলির যে কোনোটিতেই লিখিত হউক, উহাদের মূল তত্ত্বটি লওয়া হইয়াছে উপনিষদ্ই হইতে। ভারতীয় দর্শনসমূহের মূল তত্ত্বগুলির অধিকাংশেরই স্ফুরণ হইয়াছে উপনিষদ্ই হইতে। তাই উপনিষদ্ হইতেছে ভারতের অথবা কেবল ভারতেরই নহে, সমস্ত জগতের অমূল্য সম্পদ্। দেশ-জাতি-নির্বিশেষে যে-কেহ ইহার কথা জীবনে পালন করিবার চেষ্টা করিবেন, তিনিই ইহাতে হৃদয়ের আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

মূল উপনিষদের স্থানে-স্থানে অনেক কথা সাঙ্কেতিক বা লাক্ষণিক ভাষায়, অথবা ছোট ছোট গল্প-উপাখ্যানের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা আলোচ্য বিষয়ে ইহার কিছু-কিঞ্চিৎ সহজ কথায় এই পুস্তিকায় দেখিবার চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মবিচার

পূর্বে বলা হইয়াছে মানবের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে তাহার আত্মা বা নিজের কথা লইয়া। সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়া আত্মাকে আত্মা বলা হয়। এ শব্দটি অৎ ধাতু হইতে, ইহার অর্থ গমন করা বা ব্যাপ্ত করা। মাথার চুলের ডগা হইতে পায়ের আঙুলের ডগা পর্যন্ত এক-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধরিয়া-ধরিয়া যদি কাহাকেও প্রশ্ন করা যায় 'তুমি কে?' উত্তর পাওয়া যাইবে 'আমি', 'আমি'। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় 'আমি' বলিয়া আমরা যাহাকে মনে করি তাহা শরীরের সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে।[১]

পরে আমরা দেখিতে পাইব এই আত্মাই হইতেছে বিশ্বাত্মা। এই আত্মাই সব। তাই এই সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়াও ইহা আত্মা। আর এই জন্যই ইহার আর একটি নাম ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (বৃহ্ ধাতু 'বড় হওয়া')। এ কথা পরে আরো স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে।

আমরা দেখিয়াছি আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই হইতেছে উপনিষদের আলোচ্য। এই আত্মবিদ্যা কী এবং কেনই বা আলোচ্য, আমরা একটু দেখিতে চেষ্টা করিব। একখানি উপনিষদে (বৃ. উ. ২-৪ ও ৪-৫) এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। যথা—

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিলেন, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী

১ কেহ কেহ মনে করেন, যেহেতু ইহা শব্দ প্রভৃতি বিষয়কে গ্রহণ করে (আ- দা ধাতু, 'গ্রহণ করা', অথবা উপভোগ করে (অদ্ ধাতু 'ভোজন করা') সেই জন্যও ইহা আত্মা।

ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী, অর্থাৎ তিনি বেদ-বেদান্তের কথা আলোচনা করিতেন। আর কাত্যায়নীর বুদ্ধি ছিল সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছায় একদিন মৈত্রেয়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মৈত্রেয়ী, আমি তো সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাই। এস, কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার একটা মীমাংসা করিয়া দিই।'

মৈত্রেয়ী কহিলেন 'ভগবন্, যদি এই সমস্ত পৃথিবী বিত্তে পূর্ণ হয়, আমি কি তাহাতে অমৃত হইতে পারিব—আমি কি মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিব ?'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'না মৈত্রেয়ী। উপকরণ-সামগ্রী থাকিলে মানুষের জীবন যেমন হয়, তোমারো তেমনি হইবে। ধনের দ্বারা অমৃত হইবার আশা নাই।'

মৈত্রেয়ী বলিলেন 'যাহাতে অমৃত হইতে পারিব না, তাহার দ্বারা আমি কী করিব ? এ বিষয়ে আপনি যাহা জানেন তাহাই বলুন।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই উত্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন 'ওগো, তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমাকে প্রিয় কথাই বলিতেছ। ভাল মৈত্রেয়ী, এস, বস। আমি বুঝাইয়া বলিতেছি। মৈত্রেয়ী, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন 'ওগো, পতিকে কামনা করা হয় বলিয়া পতি প্রিয় হয় না, আত্মাকে (নিজেকে) কামনা করা হয় বলিয়াই পতি প্রিয় হয়। ওগো, স্ত্রীকে কামনা করা হয় বলিয়া স্ত্রী প্রিয় হয় না, আত্মাকে কামনা করা হয় বলিয়াই স্ত্রী প্রিয় হয়। ওগো, পুত্রকে কামনা করা হয় বলিয়া পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মাকে কামনা করা হয় বলিয়াই পুত্র প্রিয় হয়। ওগো, বিত্তকে কামনা করা হয় বলিয়া বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মাকে কামনা করা হয় বলিয়াই বিত্ত প্রিয় হয়।'

মায়ের কাছে ছেলে যে অত প্রিয় তাহার ইহাই একমাত্র কারণ যে, ছেলের মধ্যে মা আত্মাকেই (নিজেকেই) দেখেন। মায়ের কাছে মায়ে ও ছেলেতে কোনো ভেদ থাকে না। তাই ছেলের সুখ-দুঃখে মায়ের সুখ-দুঃখ। নিজের ছেলের অসুখ-বিসুখে মায়ের যে কষ্ট, অন্যের ছেলের অসুখ-বিসুখে তাঁহার সে কষ্ট হয় না। ইহার কারণ, মা নিজের ছেলের মধ্যে নিজেকে যেমন দেখেন অন্যের ছেলের মধ্যে তেমন দেখেন না।

ছেলের সুখ চাহিয়া মা বস্তুত আত্মারই সুখ চাহিয়া থাকেন। আত্মা প্রিয় বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে ছেলে প্রিয়। আত্মা হইতে আর কিছুই বেশি প্রিয় নহে, ইহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। তাই উপনিষদের আর এক স্থানে (বৃ. উ. ১-৪-৮) বলা হইয়াছে 'এই যে, অন্তরতর আত্মা, ইহা পুত্র হইতেও প্রিয়তর, বিত্ত হইতেও প্রিয়তর, এই যাহা কিছু আছে সমস্ত হইতেই প্রিয়তর। যে ব্যক্তি আত্মা হইতে অন্য কিছুকে প্রিয় বলিয়া মনে করে, প্রিয় তাহার নষ্ট হয়।'

এই উপাখ্যানের শেষে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন 'ওগো, আত্মারই দর্শন করা উচিত, আত্মারই শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করা উচিত। মৈত্রেয়ী, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও জ্ঞানের দ্বারা এই সমস্তকে জানা হয় (বৃ. উ. ২-৪-৫)।'

যাজ্ঞবল্ক্য এখানে বলিয়াছেন যে আত্মার দর্শনে সব কিছু দেখা হয়, সব কিছু জানা যায়। ইহা এই জন্যই সম্ভব হইয়া থাকে, যে, এই যাহা কিছু আছে সবই আত্মা (ছা. উ. ৭-২৫-২), আত্মা ছাড়া কিছুই নাই। তাই আত্মাকে জানিলে সবই জানা হয়।

এ সম্বন্ধে একখানি উপনিষদে (ছা. উ. ৭) এইরূপ একটি গল্প আছে। এক সময়ে নারদ সেই সময়ে প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্র ও সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন

নি। তাই তিনি ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া আবার অধ্যয়ন করিবার জন্ম প্রার্থনা করিলেন। সনৎকুমার বলিলেন, 'তুমি যাহা জান আগে তাহা আমাকে বল, পরে তদতিরিক্ত আমি বলিব।' নারদ যাহা কিছু জানিতেন সবই উল্লেখ করিয়া বলিলেন 'ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ইত্যাদি ইত্যাদি অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু, হে ভগবন্, আমি এই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া কেবল মন্ত্রবিদ্ হইয়াছি—কেবল মন্ত্রই জানিয়াছি, আত্মবিদ্ হইতে পারি নি—আত্মাকে জানিতে পারি নি। আমি কিন্তু আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আত্মাকে জানে সে শোক তরিয়া যায়। কিন্তু, হে ভগবন্, আমি শোকসন্তপ্ত। আপনি আমাকে শোকের পরপারে লইয়া চলুন।'

সনৎকুমার বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক-একটি করিয়া পর-পরবর্তী উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্টতর-উৎকৃষ্টতম বহু বস্তুর নির্দেশ করিয়া শেষে নারদকে বলিলেন যে, সুখকেই জানিতে ইচ্ছা করা উচিত।

প্রশ্ন হইল, সুখ কী?

সনৎকুমার বলিলেন 'যাহা প্রভূত ("ভূমা") তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই।'

নারদ বলিলেন 'ভগবন্, আমি প্রভূতকে জানিতে চাই।'

সনৎকুমার প্রভূত ও অল্পের ভেদ এইরূপে দেখাইয়া বলিলেন 'তাহাই প্রভূত, মানুষ যেখানে অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না। আর যেখানে অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শোনে, অন্য কিছু জানে তাহা অল্প। যাহা প্রভূত তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প তাহা মরণশীল (ছা. উ. ৭-২৩-১)।'

'ভগবন্, তাহা কোথায় প্রতিষ্ঠিত?'

'নিজের মহিমায়। অথবা, নিজের মহিমাতেও নহে।'

'গো-অশ্ব, হস্তি-হিরণ্য, দাস-ভার্যা, ক্ষেত্র-গৃহ, এই সকলকে লোকে মহিমা বলিয়া থাকে। কিন্তু আমি এরূপ বলিতেছি না যে একটি আর-একটির উপর প্রতিষ্ঠিত। (আমি যাহা বলিতেছি তাহা এই যে,) তিনি অধোভাগে, তিনি ঊর্ধ্বভাগে; তিনি পশ্চাদ্‌ভাগে; তিনি পুরোভাগে; তিনি দক্ষিণে, তিনি বামে। তিনিই এই সমস্ত।'

ইহাকেই অহম্‌-শব্দের উল্লেখে বলা হয়, 'আমিই অধোভাগে, আমিই ঊর্ধ্বভাগে; আমিই পশ্চাদ্‌ভাগে, আমিই পুরোভাগে; আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে; আমিই এই সব (ছা. উ. ৭-২৫-১)।'

আবার ব্রহ্ম-শব্দের উল্লেখে বলা যায় (মু. উ. ২-২-১১) 'ইহা অমৃত ব্রহ্মই; সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে-উত্তরে, উপরে-নীচে ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মই।'

প্রত্যেকেই অনুভব করে, এই যে তাহার আত্মা, এই যে সে আছে, তাহার মধ্যে অনেক কিছু মন্দ থাকে যাহা সে চায় না। যেমন তাহার জরা আসে, মৃত্যু আসে, ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে। এ সব মন্দ বৈ ভাল নয়। তা ছাড়া তাহার কত কামনা থাকে, সবই সফল হয় না, সত্য হয় না। সে কত সংকল্প করে, সবই সত্য হয় না। কিন্তু এমনটি যদি সম্ভব হয় যে, এই যে তাহার আত্মা তাহার কিছু মন্দ থাকিবে না, তাহার সমস্ত কামনা সত্য হইবে, সমস্ত সংকল্প সত্য হইবে; অপর কথায় তাহার সমস্ত কামনার, সমস্ত সংকল্পের অবসান হইবে, যাহা পাইলে সমস্ত পাওয়া হইয়া যাইবে, তবে কে তাহা না চাহিবে? এ বিষয় উপনিষদে (ছা. উ. ৮-৭শ) একটি গল্প আছে। সংক্ষেপে ইহা এইরূপ—

দেব ও অসুর উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। একদিন প্রজাপতি বলিতেছিলেন যে, যাহার কোনোরূপ কিছু মন্দ নাই—জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, যাহার সমস্ত কামনা সত্য হয়, সমস্ত সংকল্প

সত্য হয়, সেই আত্মাকে অন্বেষণ করা উচিত, জানা উচিত। যে ইহাকে জানে তাহার সমস্ত উপভোগ্য পাওয়া হয়, সমস্ত কামনা পাওয়া হয়।

দেব ও অসুর উভয়েই ইহা শুনিয়াছিলেন, এবং ইহা শুনিয়া, বলাই বাহুল্য, তাঁহারা উহার অন্বেষণ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

দেবগণের ইন্দ্র ও অসুরগণের বিরোচন এই উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং হাতে সমিধ্[১] লইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন।

কী উদ্দেশ্যে তাঁহারা আসিয়াছেন, প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তাহা বলিলেন। তিনি যে আত্মার কথা বলিয়াছিলেন তাহা জানা বড় সহজ নহে। ইহা অতি গম্ভীর, অতি সূক্ষ্ম, ইহাকে জানিবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করা চাই। চিত্তের সেইরূপ সংস্কার আবশ্যক। তাই তাঁহারা উভয়েই তাঁহার আদেশ ও উপদেশে বত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার কাছে ব্রহ্মচর্য পালন করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি ভাবিলেন, যদিও তাঁহারা ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছেন তথাপি তাঁহাদের তখনো তেমন যোগ্যতা লাভ হয় নি যাহাতে তাঁহারা একেবারে সমগ্র আত্মতত্ত্বকে ভাল করিয়া জানিতে বুঝিতে পারেন। তাই তিনি ধীরে-ধীরে ক্রমে-ক্রমে আত্মার স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—ঠিক যেমন কেহ শুক্ল দ্বিতীয়া রাত্রির সন্ধ্যায় কোনো ব্যক্তিকে অতি সূক্ষ্ম চন্দ্রকলা দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে কোনো এক উচ্চ বৃক্ষের অগ্রভাগ দেখাইয়া বলে 'দেখ এই চন্দ্র', যদিও বস্তুত তাহা চন্দ্র নহে। তার পর

১ পূর্বে কোন বিদ্যা, বিশেষত ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যার যোগ্যতা লাভের জন্য শিষ্যকে কিছুকাল গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া বাস করিতে হইত। এই সময়ে শিষ্যকে গুরুর স্থাপিত অগ্নিতে সমিধ্, অর্থাৎ যজ্ঞির কাষ্ঠ দিয়া তাহা জ্বালিয়া রাখিতে হইত। বিনা ব্রহ্মচর্যে ব্রহ্মবিদ্যার লাভ উপনিষদে বলা হয় নি।

এইরূপ একটির পর অন্যটি, তার পর অপর একটি, এই প্রকার উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থকে লক্ষ্য করাইয়া শেষে কোনো পর্বত শৃঙ্গ দেখাইয়া বলে 'ঐ দেখ, ঐ চন্দ্র।' যদিও ঐ ব্যক্তিটি প্রথমবারেই ঐ চাঁদকে দেখিতে পায় না, তথাপি পরিশেষে সে তাহা দেখিতে পায়। এই দেখাইবার কৌশলে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা এই যে, যাহা বস্তুত চন্দ্র নহে তাহাকেও প্রথমে চন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হয়, এবং তাহা হইলেও শেষে সত্য চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ঠিক এইরূপেই অতিসূক্ষ্ম আত্মাকে একেবারে দেখিতে না পাওয়া গেলেও প্রজাপতি এমন একটি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার শিষ্যদ্বয় অতিসূক্ষ্ম আত্মাকে ক্রমে-ক্রমে সহজে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা প্রজাপতির যে উপদেশটি জানিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি, একটি কথা মনে রাখিলে তাহা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

আমাদের তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত বা সুষুপ্তি (অর্থাৎ যে অবস্থায় নিদ্রিত মানুষ কোনোরূপ স্বপ্ন না দেখিয়া একেবারে শান্ত হইয়া থাকে)। এই তিন অবস্থাতেই আমরা আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু এই তিন অবস্থার অনুভবের পরস্পর ভেদ আছে। জাগ্রদ্ অবস্থায় আত্মার 'আমি স্থূল বা কৃশ', ইত্যাদি নানা অনুভব আমাদের হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখিয়া আত্মাকে অনুভব করি। আবার সুষুপ্ত অবস্থায় একটি শান্তি-সুখ অনুভবের দ্বারা আত্মার অনুভব হয়। এই তিন অবস্থায় যে তিনটি পৃথক্-পৃথক্ স্বতন্ত্র আত্মা তাহা নহে। একই আত্মার তিন অবস্থায় তিন রকমে অনুভব হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থার অতিরিক্ত আর-এক অবস্থা আছে, যাহার সহিত পূর্বোক্ত ঐ তিন অবস্থার কোনো সংসর্গ নাই, যাহা উহাদের অতীত। এই অবস্থার আত্মাকে তুরীয় (অর্থাৎ পূর্বোক্ত

ঐ তিনের অপেক্ষায় চতুর্থ) অথবা উত্তম বা পুরুষোত্তম বলা হয়। এই আত্মাই আসল আত্মা, আরম্ভে প্রজাপতি এই আত্মারই অন্বেষণের কথা বলিয়াছিলেন।

এবার আমরা প্রজাপতির গল্পটি অনুসরণ করি। আত্মাকে বুঝিতে আমরা স্বভাবত বা প্রথমত এই দেহটাকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুত যে তাহা নহে, উপদেশের কৌশলে প্রজাপতি তাহাই ক্রমে-ক্রমে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সেই মূল জায়গা হইতেই আরম্ভ করিতেছেন। চোখের সামনে আয়নার মত কোনো কিছু ধরিলে তাহাতে তাহার ছায়া পড়ে। ইহাই অবলম্বন করিয়া প্রজাপতি নিজের শিষ্য দুইটিকে দেহই যে আত্মা তাহাই আপাতত জানাইতে চাহিতেছেন। তিনি বলিলেন, দেখ 'এই যে চোখের মধ্যে পুরুষ (মানুষ) দেখা যাইতেছে ইহা আত্মা, ইহার মরণ নাই, ভয় নাই, ইহা ব্রহ্ম।' প্রজাপতির কথা শুনিয়া শিষ্য দুইটি প্রশ্ন করিলেন, 'ভগবন্, আর এই যে, জলের মধ্যে, আয়নার মধ্যে পুরুষ দেখা যাইতেছে, এ কে?' প্রজাপতি বলিলেন, 'ইহাই সর্বত্র'।

তিনি তো উপদেশ দিলেন, কিন্তু শিষ্যদ্বয়ের বুদ্ধিবৃত্তির কথা ভাবিয়া বলিলেন 'কোনো জলপূর্ণ পাত্রে আত্মাকে (নিজেকে) দেখিয়া যদি তাহার সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে না পার তো আমাকে তাহা বলিও।'

প্রজাপতি প্রশ্ন করিলেন 'কী দেখিতেছ'?

'ভগবন্, নিজেকেই দেখিতেছি, লোম ও নখ পর্যন্ত নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতেছি।'

'তোমরা উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, উত্তম বসন পরিধান করিয়া সজ্জিত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে নিজেকে দেখ।'

তাঁহারা সেইরূপ করিলে প্রজাপতি আবার প্রশ্ন করিলেন 'কী দেখিতেছ?'

'ভগবন্, আমরা যেমন উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছি, উত্তম বসন পরিধান করিয়া সজ্জিত হইয়াছি, ইহারাও ঠিক সেইরূপ।'

প্রজাপতি বলিলেন, 'এই আত্মা, ইহার মরণ নাই, ভয় নাই, ইহা ব্রহ্ম।'

ইন্দ্র ও বিরোচন শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বলিলেন 'ইহারা আত্মাকে না পাইয়াই, না বুঝিয়াই যাইতেছে। দেবতারাই হউক, আর অসুরেরাই হউক, যাহারাই ইহাদের মধ্যে এই উপনিষদ্‌কে জানিবে তাহারাই পরাভব প্রাপ্ত হইবে।'

বিরোচন শান্তহৃদয়ে অসুরদের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া প্রচার করিলেন 'এই আত্মারই (অর্থাৎ দেহেরই) পরিচর্যা করা উচিত। ইহার পরিচর্যায়, ইহার সৎকারে, এই এবং ঐ, উভয় লোকই পাওয়া যায়। তাই অদ্যাপি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও যজ্ঞহীন ব্যক্তিকে লোকে আসুর (অর্থাৎ অসুর-ভাবসম্পন্ন) বলিয়া থাকে। ইহা অসুরগণেরই উপনিষদ্।'

ইন্দ্র কিন্তু দেবগণের নিকট না গিয়াই এই ভয় দেখিলেন, 'এই শরীরকে উত্তমরূপে অলঙ্কৃত করিলে উহাও (ঐ প্রতিবিম্বও) উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হয়। ইহাকে উত্তম বসন পরিধান করাইলে উহারও উত্তম বসন. পরিধান করান হয়। ইহা পরিষ্কৃত হইলে উহাও পরিষ্কৃত হয়। তেমনি ইহা অন্ধ হইলে উহাও অন্ধ হয়। ইহা খঞ্জ হইলে উহাও খঞ্জ হয়। ইহার কোনো অঙ্গ ছিন্ন হইলে উহারও তাহা ছিন্ন হয়। ইহার নাশ হইলে তদনুসারে উহারও নাশ হইয়া থাকে। আমি তো ইহাতে কিছু উপভোগ্য দেখিতেছি না।'

ইন্দ্র হস্তে সমিধ্ লইয়া আবার প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি বলিলেন, 'ইন্দ্র, তুমি তো বিরোচনের সঙ্গে শান্তহৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে, আবার কী ইচ্ছায় ফিরিয়া আসিলে?' ইন্দ্র নিজের পূর্বোক্ত

ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন 'ভগবন্, আমি তো ইহাতে কিছু উপভোগ্য দেখিতেছি না।'

প্রজাপতি বলিলেন 'ইন্দ্র, ইহা এইরূপই। আবার আমি ইহা তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব। আরো বত্রিশ বৎসর এখানে বাস কর।' ইন্দ্র তাহাই করিলেন।

প্রজাপতি ইন্দ্রকে স্থুল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যাইতেছেন। জাগ্রদ্ অবস্থার কথা ছাড়িয়া এইবার তিনি স্বপ্নাবস্থার আত্মার কথা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন—

'যিনি এই স্বপ্নে মহান্ হইয়া বিচরণ করেন তিনি আত্মা, তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম।'

এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গেলেন, কিন্তু দেবগণের নিকট যাইবার পূর্বেই তিনি ইহাতেও এই ভয় দেখিলেন যে, 'যদিও এই শরীর অন্ধ হইলেও উহা (স্বপ্নাবস্থার আত্মা) অন্ধ হয় না; এই শরীর খঞ্জ হইলেও উহা খঞ্জ হয় না; বা ইহার দোষে উহার কোনো দোষ হয় না; তথাপি মনে হয়, স্বপ্নের মধ্যে তাহাকে যেন কেহ পশ্চাদনুসরণ করে; সে যেন অপ্রিয় অনুভব করে, সে যেন রোদন করে। তাই আমি ইহাতে কিছু উপভোগ্য দেখিতেছি না।'

এই ভাবিয়া ইন্দ্র সমিধ্-হস্তে আবার প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইন্দ্র শান্তহৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে, আবার কী উদ্দেশ্যে ফিরিয়া আসিলে?' ইন্দ্র সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে আরো বত্রিশ বৎসর সেখানে ব্রহ্মচর্য-বাস করিবার আদেশ দিয়া বলিলেন 'আবার আমি তোমাকে ইহা বুঝাইব।'

ইন্দ্র সেইরূপ করিলে প্রজাপতি বলিলেন 'এই জীব যখন গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন হইয়া একীভূত যায়, ভিতরে বাহিরে কোথাও কোনো

ইন্দ্রিয়ের একটুও কোনো কিছু ক্রিয়ার লেশ থাকে না, তখন তাহাই আত্মা, তাহাই অমৃত, অভয়, তাহাই ব্রহ্ম।'

ইন্দ্র 'আবার শান্তহৃদয়ে চলিয়া গেলেন, কিন্তু দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই তাঁহার মনে হইল নিশ্চয়ই সেই সময়ে "এই আমি" এই রূপে তো সে নিজেকে জানিতে পারে না; এই সমস্ত পদার্থকেও সে জানিতে পারে না (—যেমন সে জাগরণে বা স্বপ্নে জানিয়া থাকে), সে যেন তখন বিনষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়া তিরোহিত হইয়া পড়ে। তাঁহার মনে হইল ইহাতে কিছু উপভোগ্য নাই'।

এই জন্য তিনি আবার সমিধ্-হস্তে প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের আশঙ্কার কথা খুলিয়া বলিলে প্রজাপতি তাঁহাকে আরো পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য-বাসের আদেশ দিয়া বলিলেন 'ইন্দ্র, আবার আমি ইহা বুঝাইয়া বলিব।'

প্রজাপতি ইন্দ্রকে চারি পর্যায়ে আত্মার উপদেশ দিতেছেন। এবার তিনি শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন 'ইন্দ্র, শরীর মরণশীল, মৃত্যু ইহাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। আত্মার শরীরও নাই, মরণও নাই। শরীর হইতেছে অশরীর অমরণ আত্মার অধিষ্ঠান-মাত্র। যাহার শরীর আছে, প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে পাইয়া বসে। যাহার শরীর আছে তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়েরই বিনাশ নাই। যাহার শরীর নাই, তাহাকেই প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই স্পর্শ করিতে পারে না।'

আত্মার যে শরীরের সহিত বস্তুত কোনো সম্বন্ধ নাই ইহাই এখানে প্রজাপতি ইন্দ্রকে বিশেষভাবে বুঝাইতে চাহিতেছেন।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় ক্রমে ক্রমে আত্মার অবস্থা বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর-একটি অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থা আছে। সংস্কৃতে চতুর্থ শব্দেরই রূপান্তর তুরীয়। এই চতুর্থ অবস্থার আত্মার

কথা প্রজাপতি চতুর্থ পর্যায়ে বলিতেছেন। এ অবস্থায় শরীরের সহিত আত্মার কোনো সম্বন্ধ থাকে না। প্রজাপতি ইন্দ্রকে ইহাই কয়েকটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—

'বায়ুর শরীর নাই; মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র, ইহাদেরও শরীর নাই। এরা যেমন ঐ আকাশ হইতে উঠিয়া পরম জ্যোতি পাইয়া নিজের নিজের রূপ লাভ করে, এই সুনির্মল (আত্মা)ও তেমনি এই শরীর হইতে উঠিয়া পরম জ্যোতি পাইয়া নিজের রূপ লাভ করে। ইহাই উত্তম পুরুষ।'

ইহার তাৎপর্য এই যে, বায়ু প্রভৃতি যেমন আকাশের সহিত মিশিয়া থাকে, তাহাদিগকে যেমন ভিন্নরূপে দেখিতে বা বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু পরে শীতের অবসানে সূর্যের তাপে তাহাদিগকে আকাশ হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; অর্থাৎ বায়ু আগে যে শান্ত-স্তিমিতভাবে ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাকে পূর্বাদি দিক্ হইতে বহিতে দেখা যায়; মেঘকে হস্তী, পর্বত ইত্যাদি আকারে, বিদ্যুৎকে লতার আকারে এবং বজ্রকেও গর্জনকারী বজ্র আকারে দেখা যায়, এবং তাহারা এইরূপে নিজ-নিজ আকার লাভ করে, আত্মাও সেইরূপ এই শরীর হইতে উঠিয়া পরম জ্যোতিকে লাভ করিয়া নিজের স্বরূপকে লাভ করে। এইরূপে শরীরের সহিত সর্বপ্রকারে সম্পর্কহীন আত্মাই হইল আসল আত্মা। ইহাই আত্মার স্বরূপ। ইহা আনন্দপূর্ণ।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, এবং দেবতা ও অসুরগণ শুনিয়াছিলেন—

'যে আত্মার কোনোরূপ কিছু মন্দ নাই—জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, যাহার সমস্ত কামনা সত্য, সমস্ত সঙ্কল্প সত্য, তাহাকে অন্বেষণ করা উচিত, জানা উচিত। যে ইহা জানে, তাহার সমস্ত উপভোগ্য পাওয়া হয়, সমস্ত কামনা পাওয়া হয়।'

বস্তুত এই আত্মাই যে আমাদের মধ্যে দর্শনাদি কাজ করে, আর চক্ষু প্রভৃতি হইতেছে ঐ দর্শনাদি কাজের উপায়, ইহাই প্রজাপতি পরিশেষে ইন্দ্রকে বলিতেছেন। প্রথমত তিনি চক্ষুকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন 'সেই যে, শরীরহীন আত্মা তাহাই দর্শন করে, চক্ষু হইতেছে তাহার দর্শনের জন্য। যে ঘ্রাণ করিতে চায়, সে আত্মা, ঘ্রাণ হইতেছে গন্ধ গ্রহণের জন্য। যে কথা বলিতে চায়, সে আত্মা, বাক্ হইতেছে কথা বলিবার জন্য। যে শুনিতে চায় সে আত্মা, কান হইতেছে শব্দ শুনিবার জন্য। যে মনন বা চিন্তা করিতে চায় সে আত্মা, মন হইতেছে মনন করিবার জন্য। মন দিব্য চক্ষু।'

এই কথাটিই অন্যস্থানে (ঐ. উ. ৩-১) এইরূপ বলা হইয়াছে—

'কে এই আত্মা? কাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া উপাসনা করি?'

'এই যে হৃদয়, এই মন, (ইহার যোগে) লোক যাহা দ্বারা দেখে, বা যাহা দ্বারা শোনে, বা যাহা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, বা কথা বলে, বা স্বাদু-অস্বাদু জানে।'

কোনো কোনো ঋষি (তৈ. উ. ব্রহ্মবল্লী) পূর্বোক্ত আত্মার আসল রূপটি আলোচনা করিয়া অতিচমৎকার রূপকে তাহার যে বর্ণনা করিয়াছেন, সহজ কথায় বলিতে গেলে তাহা এইরূপ দাঁড়ায়—

তরোয়ালের কোশ বা খাপ থাকে। তরোয়াল খাপের মধ্যে থাকিলে খাপখানাই দেখা যায়। আসল তরোয়ালখানা দেখা যায় না, খাপের মধ্যে তাহা ঢাকা থাকে। আত্মারও যেন এইরূপ কোশ আছে। আর এই কোশ একটি মাত্র নয়, পাঁচ-পাঁচটি। একটির ভিতর অন্যটি, তার ভিতর অন্য একটি, এইরূপে পরে পরে। আত্মার- আসল রূপটি এই কোশগুলির দ্বারা ঢাকা আছে। কোশগুলির তত্ত্ব জানিলে আসল জিনিসটি তখনো ঢাকা থাকিলেও উহা ঠিক-ঠাক বুঝা যায়,

যেমন তরোয়ালের খাপ খানি জানা থাকিলে তাহাতে ঢাকা তরোয়াল-খানি জানা যায়।

ঐ পাঁচটি কোশের প্রথমটি হইতেছে অন্নময়[১] অর্থাৎ অন্নের ভোজনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই দেহ। মানুষ বলে 'আমি কৃষ্ণ বা গৌরবর্ণ' অথবা 'আমি স্থূল বা কৃশ।' এখানে মানুষের আসল রূপটি গৌর-কৃষ্ণ বা স্থূল-কৃশ কিছুই নহে। দেহরূপ ঢাকনীর মধ্যে থাকায় ইহারই ঐ গুণগুলি আসল আত্মার বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় কোশ হইতেছে প্রাণময়। প্রাণ বলিতে এখানে প্রাণবায়ু। 'আমি প্রাণ ধারণ করিতেছি' অর্থাৎ 'জীবিত আছি' এইরূপ মনে করিয়া মানুষ প্রাণেরই গুণ নিজের অর্থাৎ আত্মার বলিয়া ধারণা করে, যদিও তাহা তাহার নহে। প্রাণময় কোশে ঢাকা থাকে বলিয়া তাহার এইরূপ মনে হয়।

তৃতীয় কোশ মনোময়। যাহার দ্বারা আমরা মনন বা চিন্তা করি তাহা মন। মনোময় কোশে ঢাকা থাকায় মানুষ 'আমি মনে করি' ইত্যাদি ভাবে। বস্তুত এই যে মনন তাহা আত্মার নহে।

চতুর্থ কোশ বিজ্ঞানময়। এখানে বিজ্ঞান আর জ্ঞান একই। ইহা যে কোনো বস্তুজ্ঞান। মানুষ বলে 'আমি জানি'। বস্তুত এ জ্ঞান আত্মার নহে।

পরিশেষে পঞ্চম কোশ হইতেছে আনন্দময়। মানুষ বলে 'আমি আনন্দিত হইতেছি'। এখানে আসল আত্মা এ জ্ঞানের অতীত, এ জ্ঞান তাহার হয় না। অথচ লোকে এরূপ বলিয়া থাকে। ইহাতে আত্মার আসল রূপ ঢাকা থাকে। তাই ইহাকেও কোশ বলা হইয়া থাকে।

আসল আত্মা হইতেছে এই সমস্ত কোশের অতীত।

১ কখনো কখনো ইহাকে কেবল অন্ন, বা অন্নরসময়, বা কেবল রস শব্দেও উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মতত্ত্ব

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা ব্রহ্ম বা আত্মার কথা কিছু-কিছু আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি উপনিষদে বলা হইয়াছে আত্মা বা ব্রহ্মই সর্বত্র। তিনি উপরে, তিনি নীচে, তিনি সম্মুখে, তিনি পশ্চাতে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, সর্বত্র তিনিই। উপনিষদের অন্যত্রও অনেক স্থানে বলা হইয়াছে (ছা. উ. ৭-২৫-২) "এইসব আত্মাই", "এইসব ব্রহ্মই" (বৃ. উ. ৩-১৪-১)। এইরূপ অনেক। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এই আত্মা বা ব্রহ্মকে জানা উচিত, ইহাকে জানিলে সমস্ত পাওয়ার অবসান হয়। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আরো কিছু আলোচনা করিয়া এ বিষয়টি ভালরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে আত্মা কে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছিল যে, মানুষে যাহার দ্বারা দর্শন প্রভৃতি করে তাহাই আত্মা। উপনিষদের অন্য এক স্থানে (কেন. ১-১-৭) এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তরটি বড় সুন্দররূপে বলা হইয়াছে। এখানে প্রশ্নটি এইরূপ—

'মন কাঁহার ইচ্ছায় ধাবিত হয়? কাঁহার নিয়োগে প্রাণবায়ু চলাচল করে? কাঁহার ইচ্ছায় (মানুষেরা) কথা বলে। কে সেই দেব যিনি চক্ষু ও কর্ণকে নিযুক্ত করেন?'

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এইরূপ—'তিনি হইতেছেন কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাকেরও বাক্, প্রাণেরও প্রাণ, এবং চক্ষুরও চক্ষু। সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্ যায় না, মন যায় না। আমরা জানি না, বুঝি না যেরূপে ইহার উপদেশ দিতে পারা যায়। যাঁহারা আমাদিগকে ইহা বুঝাইয়াছিলেন সেই প্রাচীনগণের নিকট শুনিয়াছি যে, যাহা জানা

তাহা হইতে ইনি অন্য, এবং যাহা অজানা ইনি হইতেছেন তাহারও উপরে। যিনি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত হন না, প্রত্যুত বাগিন্দ্রিয়ই যাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; এই লোকেরা যাহাকে (ব্রহ্ম বলিয়া) মনে করে তিনি তাহা নহেন। যিনি মনের দ্বারা চিন্তা করেন না, প্রত্যুত মনকেই যিনি চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকেরা এই যাহাকে মনে করে তিনি তাহা নহেন। যিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, প্রত্যুত চক্ষুকেই যিনি দর্শন করেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকেরা যাহা মনে করে তিনি তাহা নহেন। যিনি কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করেন না, প্রত্যুত কর্ণই যাঁহা দ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকেরা যাহা মনে করে তিনি তাহা নহেন।'

ইহার তাৎপর্য এই যে, এই যে ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয়, ইহাদের সমস্ত শক্তিই বস্তুত ব্রহ্মেরই শক্তি, তাহাদের নিজের নহে। মানুষ দেহ বা ইন্দ্রিয়গুলিকেই ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, যাঁহা হইতে ইহাদের উদ্ভব তিনিই হইতেছেন ব্রহ্ম। তাঁহারই মহিমায় সকলে মহিমান্বিত।

অন্যত্র (মু. উ. ৩) একটি চমৎকার ক্ষুদ্র গল্পে এইরূপ বলা হইয়াছে—

ব্রহ্ম দেবগণের জন্য বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়ে তাঁহারা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিলেন 'এ বিজয় আমাদেরই! এ মহিমা আমাদেরই!' ব্রহ্ম ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের চৈতন্যের জন্য এক কিম্ভূত-কিমাকার যক্ষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে প্রাদুর্ভূত হইলেন। কিন্তু সেই যক্ষ যে কী তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন 'অগ্নি, কে এই যক্ষ জান তো?' অগ্নি সেই যক্ষের নিকট ছুটিয়া গেলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন 'তুমি কে?'

'আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা[১]।'

'তোমার শক্তি কী?'

'পৃথিবীতে এই যাহা কিছু আছে সেই সমস্তকেই আমি দগ্ধ করিতে পারি।'

উনি একখানি তৃণ অগ্নির সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—

'ইহা দগ্ধ কর।'

অগ্নি সমস্ত বেগে তৃণখানির কাছে ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু তাহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেবগণকে বলিলেন 'কে যে এই যক্ষ জানিতে পারিলাম না।'

দেবগণ বায়ুকে বলিলেন 'বায়ু, কে এই যক্ষ, জান তো?'

ইনিও সেখানে ছুটিলেন। যক্ষ তাঁহাকে বলিলেন—

'তুমি কে?'

'আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা[২]।'

'তোমার কী শক্তি?'

'পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আমি গ্রহণ করিতে পারি।'

তিনি সম্মুখে একখানি তৃণ রাখিয়া বলিলেন 'ইহা গ্রহণ কর তো।'

বায়ু সমস্ত বেগে উহার কাছে গেলেন, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেবগণকে বলিলেন 'কে যে এই যক্ষ জানিতে পারিলাম না।'

ইহার পর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন 'হে মঘবন্[৩], জান তো কে এই যক্ষ?'

ইন্দ্র তাঁহার কাছে ছুটিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

---

১ ইহা অগ্নির অপর একটি নাম। ২ ইহা বায়ুর নামান্তর। ৩ ইন্দ্রের নামান্তর।

পরে ইন্দ্র সেই আকাশেই এক অতি সুন্দরী নারী হৈমবতী উমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন 'কে এই যক্ষ?'

'ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমরা মহিমান্বিত হইয়া থাক।'

'ইহা হইতেই ইন্দ্র জানিলেন যে, 'ইনি ব্রহ্ম।'

এই যাহা কিছু রহিয়াছে তাহার সকলেরই মূলে ব্রহ্ম। ইহা হইতেই সকলের সৃষ্টি বা প্রকাশ, ইহাতেই সকলের স্থিতি, এবং ইহাতেই সকলের লয়—ঠিক যেমন সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদ প্রভৃতি প্রকাশ পায়, তাহাতেই তাহারা অবস্থিত থাকে, এবং তাহাতেই তাহারা বিলীন হইয়া যায়। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে, যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। ইনি যে কত মহান্, কত বিরাট তাহা ঠিক বলা যায় না, তথাপি বর্ণনা করা হয় (মু.উ.২-১-৪) যে, অগ্নি ইহার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য ইহার চক্ষু, দিক্ ইহার কর্ণ, বায়ু ইহার প্রাণ, বিশ্ব ইহার হৃদয়, পৃথিবী ইহার চরণ, আর ইনি নিজেই হইতেছেন ইহার অন্তরাত্মা। ইহা হইতেই সমুদ্র- ও পর্বত-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, নদীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে; সমস্ত রস- ও ওষধি-সমূহ ইহা হইতেই; ইনি এই সকলের অন্তরাত্মা। ইনি শুভ্র এবং জ্যোতিরও জ্যোতি। সূর্য তাঁহার কাছে প্রকাশ পায় না, চন্দ্র প্রকাশ পায় না, তারা প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না। আগুন আর কোথায়? তিনি প্রকাশ পান বলিয়াই আর সব কিছু তাঁহার অনুসরণে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাঁহারই প্রভায় এই সমস্ত প্রকাশ পায় (মু. উ. ২-২-১০)।

এক সময়ে বিদেহদেশের রাজা জনক এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি উহাতে প্রচুর দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে কুরু ও পঞ্চাল দেশের বহু ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে কে ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বা বেদজ্ঞ, ইহা জানিবার জন্য জনকের কৌতূহল হইয়াছিল। এই জন্য তিনি এক স্থানে এক সহস্র

গাভীকে বাঁধাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক-একটি শৃঙ্গে দশ-দশ পাদ পরিমিত (এক পলের এক-চতুর্থাংশের নাম পাদ) স্বর্ণ বন্ধন করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন 'পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি এই গাভীগুলিকে লইয়া যাউন।' প্রথমে কেহই তাহা করিতে সাহস করিলেন না। পরে যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শিষ্যকে বলিলেন, 'বৎস, গাভীগুলিকে লইয়া যাও।' শিষ্য তাহাই করিলে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন 'যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'আমি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি। আমি কেবল গাভী চাই।' ইহাই উপলক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রাহ্মণগণের অনেকেরই বিচার হয়। এই বিচারে গার্গী নামে এক ব্রহ্মবাদিনী নারীও যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা ইহা পরে দেখিতে পাইব। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার এই অংশ (বৃ. উ. ৩য় অধ্যায়) অতি উপাদেয়। ইহাতে বহু প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা এখান হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

অরুণের পুত্র উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন 'যাজ্ঞবল্ক্য, মদ্রদেশে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে যজ্ঞ অধ্যয়ন করিবার জন্য আমরা বাস করিতে-ছিলাম। তাঁহার স্ত্রী হইয়াছিলেন গন্ধর্বগৃহীত (ভূতাবিষ্ট)। আমরা সেই গন্ধর্বকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম 'আপনি কে?'

'আমি আথর্বণ কবন্ধ।'

আথর্বণ কবন্ধ পতঞ্চল কাপ্য ও যাজ্ঞিকগণকে প্রশ্ন করিলেন 'কাপ্য, তুমি কি সেই সূত্রকে জান যাহা দ্বারা এই পৃথিবীলোক, ঐ পরলোক এবং এই সমস্ত ভূত একত্র গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে?'

কাপ্য উত্তর করিলেন 'না, ভগবন্, আমি জানি না।'

সেই গন্ধর্ব আবার প্রশ্ন করিলেন 'তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে

জান যিনি এই লোককে, পর লোককে ও সমস্ত ভূতকে অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করিতেছেন ?'

'না, ভগবন্ ।'

'যিনি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে জানেন তিনি ব্রহ্মকে জানেন, লোককে জানেন, ভূতসমূহকে জানেন, আত্মাকে জানেন।'

উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন 'আমি তাহা জানি, যাজ্ঞবল্ক্য। তুমি যদি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে না জানিয়াই ব্রাহ্মণগণের জন্য নির্দিষ্ট এই গাভীগুলিকে লইয়া যাও, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'গৌতম,[১] সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে আমি জানি। যে কেহ ইহা বলিতে পারে যে, "আমি ইহা জানি।" '

'তবে যেরূপে ইহা জান বল।'

'হে গৌতম, বায়ুই হইতেছে সেই সূত্র। বায়ু-সূত্র দ্বারাই, হে গৌতম, এই লোক, পর লোক, ও সমস্ত ভূত একত্র গ্রথিত হইয়া আছে।'

উদ্দালক আরুণি বলিলেন 'হাঁ যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই। এখন অন্তর্যামীর সম্বন্ধে বল।'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, অথচ পৃথিবী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

'যিনি জলে অবস্থিত, অথচ জল হইতে ভিন্ন, জল যাঁহাকে জানে না, জল যাঁহার শরীর, যিনি জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

---

১ উদ্দালকের গোত্র নাম।

'যিনি অগ্নিতে অবস্থিত, অথচ অগ্নি হইতে ভিন্ন, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

'যিনি অন্তরিক্ষে অবস্থিত, অথচ অন্তরিক্ষ হইতে ভিন্ন, অন্তরিক্ষ যাঁহাকে জানে না, অন্তরিক্ষ যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরিক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।'

যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে বায়ু, দ্যুলোক, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি বিবিধ পদার্থের উল্লেখ করিয়া উদ্দালক আরুণিকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার অন্তর্যামী যদিও সেই-সেই পদার্থে অবস্থান করে তথাপি তিনি সেই সব হইতে ভিন্ন, সে সব তাঁহাকে জানে না, সে সব হইতেছে তাঁহার শরীর, তিনি সেই সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া সেই সকলকে নিয়মিত করেন, এবং তিনিই তাঁহার অন্তর্যামী, অমৃত, আত্মা। তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দেখেন। তাঁহাকে শোনা যায় না, কিন্তু তিনি শোনেন, তাঁহাকে কেহ চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু তিনি চিন্তা করেন, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু তিনি জানেন। ইহা হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, অন্য শ্রোতা নাই, অন্য মননকর্তা নাই, অন্য জ্ঞাতা নাই। ইনিই, হে উদ্দালক আরুণি, তোমার অন্তর্যামী, অমৃত, আত্মা। ইহা ছাড়া সবই ক্লেশকর।

জনকের সভায় ব্রাহ্মণগণের যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারের প্রসঙ্গে গার্গীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। গার্গী সেখানে ব্রাহ্মণগণকে বলিয়াছিলেন 'পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আমি ইহাকে (যাজ্ঞবল্ক্যকে) দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। যদি ইনি এই প্রশ্ন দুইটির উত্তর দিতে পারেন, তবে আপনারা কেহই ইহাকে ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।' ব্রাহ্মণেরা বলিলেন 'গার্গী, তবে তুমি প্রশ্ন কর।' গার্গী প্রশ্ন করিলেন

'যাজ্ঞবল্ক্য, যেমন কাশী বা বিদেহের ক্ষত্রিয়পুত্র ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া শত্রুপীড়নকারী দুইটি বাণ হস্তে লইয়া উপস্থিত হয় আমিও তেমনি দুইটি প্রশ্ন লইয়া আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।'

'গার্গী, প্রশ্ন কর।'

গার্গী প্রশ্ন করিলেন 'যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা দ্যুলোকেরও ঊর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীরও নীচে, যাহা দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে, এবং যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে তাহা কাহাতে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে?'

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন 'গার্গী, যাহা দ্যুলোকেরও ঊর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীরও নীচে, যাহা দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে, এবং যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তিনি আকাশে ওতপ্রোত।'

'আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত?'

'গার্গী, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অক্ষর বলিয়া থাকেন। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন (যেমন অগ্নি), কোনো স্নেহবস্তু নহেন, ছায়া নহেন, অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন। তিনি অসঙ্গ, তিনি রসহীন, গন্ধহীন, চক্ষুহীন, কর্ণহীন, বাগিন্দ্রিয়হীন, মনোহীন, তেজহীন, প্রাণহীন, মুখহীন, মাত্রাহীন। তাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই।...

'হে গার্গী, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া আছে। ইহারই প্রশাসনে, হে গার্গী, দ্যুলোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া আছে। হে গার্গী, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর বিধৃত হইয়া আছে। হে গার্গী, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে শ্বেত পর্বতসমূহ হইতে পূর্ব-ও পশ্চিম-গামী নদীসমূহ, যাহার যে দিকে গতি সেই দিকে প্রবাহিত হইতেছে। 'হে গার্গী,

যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে না জানিয়া এই লোকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া হোম করে, যাগ করে, বা তপস্যা করে, তাহাদের তাহা নষ্ট হইয়া যায়। হে গার্গী, যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সে কৃপার পাত্র। কিন্তু, হে গার্গী, যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে ব্রাহ্মণ।

'গার্গী, এই সেই অক্ষরকে দর্শন করিতে পারা যায় না, কিন্তু তিনি দর্শন করেন; তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু তিনি শ্রবণ করেন; তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি মনন করেন; তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি জানেন। ইহা হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, অন্য কেহ শ্রোতা নাই, অন্য কেহ মননকর্ত্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গী, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।'

গার্গী ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন 'মাননীয় ব্রাহ্মণগণ, যদি আপনারা ইহাকে নমস্কার করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন তো তাহাই অধিক মনে করিবেন। আপনাদের মধ্যে কেহই কখনো ইহাকে ব্রহ্মবিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।'

গার্গী তখন নিবৃত্ত হইলেন।

এই অক্ষর একই অদ্বিতীয়—ইহার দ্বিতীয় কিছু নাই ("একমেবাদ্বিতীয়ম্")। জগতের আদিতে একমাত্র তিনিই ছিলেন, এবং এখনো একমাত্র তিনিই আছেন, এবং পরেও একমাত্র তিনিই থাকিবেন। যদিও জগতে বিচিত্র পদার্থ দেখা যাইতেছে তথাপি বস্তুত একমাত্র তিনিই আছেন। তাই তাঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা হয়, আর কিছুই অজানা থাকে না। উপনিষদে (ছা. ৬) এই কথাটা একটি সুন্দর গল্পের মধ্যে বলা হইয়াছে।

শ্বেতকেতু নামে আরুণির একটি পুত্র ছিল। পিতা তাঁহাকে বলিলেন 'শ্বেতকেতু, ব্রহ্মচর্য কর। সোম্য, আমাদের বংশের কেহ বেদ

অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর[১] ন্যায় থাকে না।' শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষে উপনীত অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে নীত হইলেন। তিনি সেখানে চতুর্বিংশতি বৎসর পর্যন্ত অবস্থান, এবং সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া নিজেকে অত্যন্ত মহান্ ও বেদজ্ঞ মনে ভাবিয়া স্তব্ধ (অবিনীত) হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পিতা বলিলেন 'শ্বেতকেতু, সোম্য, তুমি যে নিজেকে অত্যন্ত মহান্ ও বেদজ্ঞ ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়াছ, আচ্ছা, তুমি কি সেই উপদেশ গুরুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অচিন্তিত চিন্তিত হয়, অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়?'

'ভগবন্, সেই উপদেশটি কীরূপ?'

'হে সোম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ড জানিলে সমস্ত মৃন্ময়কেই জানা হয়, আর বিকার (অর্থাৎ ঘট, শরাব প্রভৃতি তাহার অবস্থান্তর) হইতেছে শব্দের অবলম্বন, নামমাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য;[২]

'অথবা, হে সোম্য, একটি সুবর্ণপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত সুবর্ণময় বস্তু জানা যায়, তাহার বিকার হইতেছে শব্দের অবলম্বন, নামমাত্র, সুবর্ণ ইহাই হইতেছে এখানে সত্য;

'অথবা, হে সোম্য, যেমন একখানি নরুণের দ্বারা সমস্ত লৌহময় বস্তুকে জানা যায়, তাহার বিকার হইতেছে শব্দের অবলম্বন, নামমাত্র; এখানে লৌহ ইহাই সত্য।

হে সোম্য, ঐ উপদেশ হইতেছে সেইরূপ।'

শ্বেতকেতু নিজের আচার্যগণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন 'নিশ্চয়ই

---

১ যাহারা গুণে ব্রাহ্মণ নহে, কিন্তু পরিচয় দিবার সময় কোনো প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে উল্লেখ করিয়া বলে যে, অমুক আমার পিতা, বা পিতৃব্য, বা মাতুল, ইত্যাদি তাহারাই 'ব্রহ্মবন্ধু' অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

২ কেবল ব্যবহারের জন্য ঘট, শরাব, ইত্যাদি নাম প্রয়োগ করা হয়। বস্তুত মাটি ছাড়া ওখানে অন্য কোনো পদার্থ থাকে না।

তাঁহারা ইহা জানিতেন না। যদি জানিতেন তো বলিলেন না কেন? ভগবন্, আপনিই আমাকে তাহা বলুন।'

'সোম্য, তাহাই হউক।'

এই বলিয়া আরুণি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'হে সোম্য, অগ্রে ইহা (জগৎ) একই অদ্বিতীয় ("একমেবাদ্বিতীয়ম্") সৎই ছিল। এই বিষয়ে কেহ-কেহ বলেন যে, অগ্রে ইহা একই অদ্বিতীয় অসৎই ছিল। তাহা হইতে সৎ হয়। কিন্তু, হে সোম্য, কীরূপে ইহা হইতে পারে? কীরূপে অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে? অতএব, হে সোম্য, অগ্রে ইহা একই অদ্বিতীয় সৎই ছিল।

'তাহা (সেই সৎ) ভাবিল যে, আমি বহু হইব, আমি প্রভূত হইব। এই ভাবিয়া তাহা তেজ সৃষ্টি করিল। সেই তেজ ভাবিল আমি বহু হইব, প্রভূত হইব। তাহা জল সৃষ্টি করিল। সেই জল ভাবিল যে, আমি বহু হইব, প্রভূত হইব। তাহা অন্ন (অর্থাৎ পৃথিবী) সৃষ্টি করিল। পরে সেই (সৎ) দেবতা ভাবিলেন 'ভাল, আমি এই তিনটি দেবতার (অর্থাৎ তেজ, জল, ও অন্নের) মধ্যে এই জীবরূপে আত্মার দ্বারা প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে ব্যক্ত করিব।' তিনি আরো ভাবিলেন যে, 'আমি এই তিনটি দেবতার এক-একটিকে তিন-তিন গুণ করিব।' [৩]

---

৩ তেজ, জল ও অন্ন ইহাদের প্রত্যেকটিকে তিন-তিন গুণ করার তাৎপর্য এই যে, ইহাদের প্রত্যেকটিতে প্রত্যেকের এক-এক অংশ যোগ করিয়া দেওয়া, যাহাতে তেজেরও মধ্যে জল ও অন্নের অংশ, জলেরও মধ্যে তেজ ও অন্নের অংশ, এবং অন্নেরও মধ্যে তেজ ও জলের অংশ থাকে। পারিভাষিক ভাবে ইহাকে ত্রিবৃৎকরণ বলা হয়। ইহা করিতে হইলে প্রথমে তেজ, জল ও অন্নকে দুই-দুই ভাগ করিয়া, প্রত্যেকের দ্বিতীয় ভাগকে আবার দুই-দুই ভাগ করিতে হইবে। পরে প্রত্যেকের প্রথমার্ধের সঙ্গে অপর দুইটির এক-এক চতুর্থ অংশের সহিত যোগ করিতে হইবে। যেমন—

তিনি এই জীবরূপ আত্মার দ্বারা ঐ তিনটি দেবতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপকে ব্যক্ত করিলেন, এবং এক-একটি দেবতাকে তিন-তিন গুণ করিলেন।

আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন 'হে সোম্য, কীরূপে এক-একটি দেবতা তিন-তিন গুণ হয়, তাহা আমার নিকটে অবগত হও।

'অগ্নির যাহা লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ, যাহা শুক্লরূপ তাহা জলের রূপ, এবং যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের রূপ। (অতএব) অগ্নি হইতে অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া গেল, এই যে (তেজ প্রভৃতির) তিনটি রূপ ইহাই সত্য। বিকার হইতেছে শব্দের অবলম্বন, নাম মাত্র।'[৪]

এই কথাটির তাৎপর্য এই যে, অগ্নি বলিতে আমরা তিনটি রূপ দেখিতে পাই, লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। ইহার মধ্যে লোহিত রূপটি হইল তেজের, শুক্লরূপটি হইল জলের, এবং কৃষ্ণরূপটি অন্নের (পৃথিবীর)।

তেজের ১/২ + জলের ১/৪ + অন্নের ১/৪ = তেজ।

জলের ১/২ + তেজের ১/৪ + অন্নের ১/৪ = জল।

অন্নের ১/২ + তেজের ১/৪ + জলের ১/৪ = অন্ন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের আলোচ্য স্থলে ক্ষিতি (অন্ন), জল (অপ্), ও তেজ এই তিনটিমাত্র ভূতের সৃষ্টির কথা আছে, মরুৎ ও ব্যোম এই দুইটি ভূতের সৃষ্টির কথা নাই। অন্যত্র বেদান্তের যেখানেই এই পাঁচটি ভূতের কথা আছে। সেখানে তদনুসরণে পঞ্চীকরণ বলা হয়, ত্রিবৃৎকরণ নহে।

৪ খানিকটা সোনায় যদি হার, বালা, চুড়ী ইত্যাদি গয়না করা যায়, তবে সেখানে সোনাটা প্রকৃতি, আর গয়নাগুলিকে বলা হয় বিকৃতি বা বিকার। এইরূপ খানিকটা মাটি দিয়া যদি ঘড়া ও শরা প্রভৃতি করা যায়, তবে মাটিটা প্রকৃতি, আর ঘড়া, শরা প্রভৃতি বিকৃতি বা বিকার। এইরূপ স্থলে বস্তুত ঐ সোনাই বা মাটিই হইল আসল জিনিস; হার, বালা, অথবা ঘড়া, শরা প্রভৃতি বস্তুত পৃথক্ কিছু নহে। কেবল ব্যবহারের জন্য এই নামগুলি করা হয়। নাম ছাড়া এ গুলি কিছুই নহে।

ইহাই যদি হয় তবে অগ্নি বলিয়া পৃথক্ আর কী থাকিল? কিছুই না। অতএব এইরূপ বিচার করিলে অগ্নি বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকে না, অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া যায়। এখানে যাহা কিছু সত্য তাহা হইতেছে ঐ তেজ, জল ও অন্নের ঐ ত্রিবিধ রূপ। অগ্নি বলিয়া কিছুই নাই। তথাপি এই যে, 'অগ্নি' 'অগ্নি' বলা হয়, ইহা হইতেছে কেবল আমাদের ব্যবহারের বিষয়মাত্র, শব্দমাত্র।

যাহাদের লোহিতাদি রূপ আছে সেই সমস্ত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধে আরুণির এই মত গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহাদের ঐ প্রকার কোনো রূপ নাই, যেমন মন, প্রাণ, বাক্, ইহারা কী প্রকারে যথাক্রমে অন্ন, জল ও তেজের রূপ হইতে পারে? কী প্রকারে অন্ন প্রভৃতি মন প্রভৃতিতে পরিণত হয়? আরুণি তাহার এই উত্তর দিয়াছেন (ছা. ৬-৫)—

অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়; তাহার স্থূলতম অংশ হয় মল, মধ্যম অংশ হয় মাংস, এবং যে অংশ সূক্ষ্ম তাহা হয় মন।

জল পীত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার স্থূলতম অংশ হয় মূত্র, মধ্যম অংশ হয় রক্ত, আর সূক্ষ্মতম অংশ হয় প্রাণ।

তেজ (অর্থাৎ তেজস্কর দ্রব্য—ঘৃত, তৈল প্রভৃতি) ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার স্থূলতম অংশ হয় অস্থি, মধ্যম অংশ হয় মজ্জা, আর সূক্ষ্মতম অংশ হয় বাক্ (ইন্দ্রিয়)।

এই জন্য আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন যে, মন* হইতেছে অন্নময়, অর্থাৎ অন্নের পরিণাম। প্রাণ হইতেছে আপোময় অর্থাৎ জলের পরিণাম, এবং বাক্ হইতেছে তেজোময় অর্থাৎ তেজের পরিণাম।

আরুণি ইহার পর আরো কিছু উপদেশ দিয়া পান ও ভোজনের উদাহরণে আবার তাঁহাকে ঐ তত্ত্বটি বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন, কিছু পান বা ভোজন করিলে জল সেই পীত বা ভুক্ত দ্রব্যকে পাক-

স্থলীর মধ্যে লইয়া যায়, সেখানে তাহা জীর্ণ হইয়া রসাদিরূপে পরিণত হয়, এবং ঐ রসাদি হইতে বটবীজের ন্যায় অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শরীররূপ অঙ্কুর ("শুঙ্গ") উৎপন্ন হয়। আরুণি শ্বেতকেতুর নিকটে এই অতি-সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অঙ্কুরটি কীরূপে উৎপন্ন হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

'হে সোম্য, এই যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তাহা বিনা মূলে হইবে না। অন্ন ছাড়া কোথায় ইহার মূল থাকিতে পারে? এইরূপই, হে সোম্য, অন্নরূপ অঙ্কুরের দ্বারা ইহার মূল জলকে অন্বেষণ কর, জলরূপ অঙ্কুরের দ্বারা ইহার মূল তেজকে অন্বেষণ কর, এবং তেজরূপ অঙ্কুরের দ্বারা তাহার মূল সৎকে অন্বেষণ কর। হে সোম্য, এই ভূতসমূহের মূল হইতেছে সৎ, সৎ ইহার আবাসস্থল, এবং সতেই ইহার প্রতিষ্ঠা।'

আরুণি ইহার পর শ্বেতকেতুকে আবার বলিলেন 'হে সোম্য, মানুষ যখন (পরলোকে) প্রস্থান করে, তখন তাহার বাক্ মনে সম্মিলিত হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, এবং তেজ পরম (অর্থাৎ সেই সৎ) দেবতায় সম্মিলিত হয়—সেই যিনি এই সূক্ষ্মতম, ইনিই এই সকলের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমি তিনি ("তৎ ত্বমসি")।'

এই বিষয়টি নিশ্চয়ই সুগম নয়। তাই পুত্র শ্বেতকেতু ইহা ভাল-রূপে বুঝিয়া লইবার জন্য পিতাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর পিতাও পুত্রকে তদনুরূপ উত্তর দিতে লাগিলেন। পিতা বলিলেন—

'বৎস, এই গাছ হইতে একটি বটের ফল আনয়ন কর।'

'এই, ভগবন্।'

'ইহা ভাঙিয়া ফেল।'

'ভগবন্, ভাঙিলাম।'

'ইহাতে কী দেখিতে পাইতেছ?'

'ভগবন্, খুব সূক্ষ্ম বীজসমূহ।'

'ইহাদের একটিকে ভাঙ।'

'ভগবন্, ভাঙিলাম।'

'এখানে কী দেখিতেছ?'

'ভগবন্, কিছুই না।'

আরুণি বলিলেন 'সোম্য, এই যে অতিসূক্ষ্ম বস্তু যাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না, ইহাই হইতে—এই অতিসূক্ষ্ম বস্তু হইতে এই মহান্ বটবৃক্ষ হইয়াছে। হে সোম্য, ইহা শ্রদ্ধা কর।'

এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আবার বলিলেন 'সেই যে এই অণুতম বস্তু ইহাই এই সকলের আত্মা। তিনিই সত্য; তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমি তিনি।'

কোনো সময়ে কোনো বস্তুকে দেখিতে না পাওয়া গেলেও সময়ান্তরে বা বিশেষ উপায়ে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য বিষয়ে আরুণি এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিয়া শ্বেতকেতুকে বলিলেন—

'জলের মধ্যে একখণ্ড লবণ রাখিয়া প্রাতে আমার নিকটে আসিও।'

তিনি তাহাই করিলে আরুণি বলিলেন 'রাত্রে জলের মধ্যে যে লবণখণ্ড রাখিয়াছিলে তাহা আনয়ন কর।'

শ্বেতকেতু তাহা হাতড়াইয়া পাইলেন না, কেননা তাহা গলিয়া গিয়াছিল। আরুণি বলিলেন—

'ভাল, এক ধার হইতে একটু পান কর। কেমন লাগিতেছে?'

'নোনা।'

'মধ্য হইতে একটু পান কর। কেমন?'

'নোনা।'

'অপর ধার হইতে একটু পান কর। কেমন?'

'নোনা।'

অনন্তর আরুণি শ্বেতকেতুকে ঐ নোনা জলটুকু ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে আসিতে বলিলেন। তিনি আসিলে আরুণি তাঁহাকে বলিলেন যে, নুনটা ঐ জলেই ছিল, যদিও দেখা যাইতেছিল না। এই দৃষ্টান্তেই আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন 'হে সোম্য, নিশ্চয়ই এখানে সৎ রহিয়াছেন, কিন্তু তুমি দেখিতে পাইতেছ না। নিশ্চয়ই তিনি এখানে আছেন।'

এই বলিয়া আরুণি নিজের পূর্ব কথাটিই আবার দৃঢ়ভাবে বলিলেন 'সেই যে এই অণুতম, ইহাই এই সকলের আত্মা, তিনি সত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতু তুমি তিনি।'

যদি তিনি নিত্যই আছেন তবে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কেন? পুত্রের এই প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিল। পিতা উত্তর করিলেন, চোখ বাঁধা থাকিলে যেমন তাহাতে দেখা যায় না, এখানেও তেমনি চোখের বাঁধন আছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি চেষ্টা করিলে সহজেই ইহা খুলিয়া যায়। তিনি বলিলেন—

'হে সোম্য, যেমন যদি কোনো ব্যক্তির চোখ বাঁধিয়া তাহাকে গন্ধার দেশ হইতে লইয়া গিয়া এক জনশূন্য স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর সে সেই অবস্থায় পূর্বমুখে, উত্তরমুখে, পশ্চিমমুখে বা দক্ষিণমুখে [illegible] বলিতে থাকে যে, ওগো আমাকে আমার চোখ বাঁধিয়া এখানে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তবে কেহ যদি তাহার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিয়া দেয় যে, 'এই দিক গন্ধার, এই দিকে যাও', তাহা হইলে, সে পণ্ডিত ও মেধাবী হইলে, গ্রাম হইতে গ্রামে জিজ্ঞাসা করিতে-করিতে গন্ধার দেশেই উপস্থিত হয়; এইরূপ যাহার আচার্য থাকে সে জানিতে পারে।'

——

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মসাধনা

পূর্বাধ্যায়ে আমরা ব্রহ্ম- বা আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা উপনিষদ্ হইতে এমন কয়েকটি কথা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব যাহা আলোচনা বা ভাবনা করিলে মন ক্রমশ নির্মল হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল হইতে পারে।

এখানেও আমরা প্রথমে একটা গল্প হইতেই আরম্ভ করি (বৃ. উ. ৫-২)। প্রজাপতির তিন শ্রেণীর সন্তান ছিল, দেবগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ। ইহারা সকলেই পিতা প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্যের জন্য বাস করিতেছিলেন। ব্রহ্মচর্য শেষ হইলে দেবগণ পিতাকে বলিলেন 'আমাদিগকে এখন কিছু বলুন।'

তিনি তাঁহাদিগকে দ এই অক্ষরটি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'বুঝিয়াছ?'

তাঁহারা বলিলেন 'হাঁ, বুঝিয়াছি। আপনি আমাদিগকে 'দান্ত হও' (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর), ইহাই বলিলেন।'

'হাঁ, বুঝিয়াছ।'

অনন্তর মনুষ্যগণ তাঁহাকে বলিলেন 'আমাদিগকে কিছু বলুন।'

তিনি ইঁহাদিগকেও দ এই অক্ষরটি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'বুঝিয়াছ?'

'হাঁ, বুঝিয়াছি। দান কর ইহাই আপনি আমাদিগকে বলিলেন।'

'হাঁ, বুঝিয়াছ।'

ইহার পর অসুরগণ তাঁহাকে বলিলেন 'আমাদিগকে কিছু বলুন।'

তিনি ইহাদিগকেও দ এই অক্ষরটিই বলিয়া প্রশ্ন করিলেন 'বুঝিয়াছ ?'

'হাঁ, বুঝিয়াছি। দয়া কর ইহাই আপনি আমাদিগকে বলিলেন।'

'হাঁ, বুঝিয়াছ। এই যে দৈববাণী, মেঘগর্জন দ—দ—দ, ইহা হইতেছে যথাক্রমে ইন্দ্রিয় দমন কর, দান কর ও দয়া কর। ইহা হইতে দম, দান ও দয়া শিক্ষা করিবে।'

দেব, মনুষ্য ও অসুর, ইহারা উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট। প্রজাপতি ইঁহাদের চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের যাহাতে উপকার হইবে মনে করিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে সেইরূপই বিধান করিলেন।

দম, দান ও দয়া না থাকিলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না।

যে কোনো বিষয়েই হউক, কাম বা কামনা বা অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি হইতেছে মানুষের বন্ধন ; অন্য কোনো বন্ধন নাই। ভারতের সমস্ত ধর্মের মূলে ইহাই দেখা যায়। উপনিষদের ধর্মেরও গোড়ায় ইহাই রহিয়াছে। এই কথাটাই একটি গল্পের মধ্যে চমৎকার ভাবে বলা হইয়াছে। তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলি (ক. উ. ১-১)।

পূর্বকালে আমাদের দেশে বিশ্বজিৎ নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইত। ইহার বিশেষত্ব এই ছিল যে. যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাকে নিজের যাহা কিছু থাকিত সমস্তই দান করিতে হইত, নিজের জন্য কিছুই রাখিতে পারা যাইত না। একদিন এক ঋষি যখন এই যজ্ঞে নিজের সবই কিছু দক্ষিণারূপে দান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বালক পুত্র নচিকেতার চিত্তে বড়ই শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। তিনি পিতাকে বলিলেন 'পিতা আমাকে কাহার নিকটে দান করিবেন ?'

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। নচিকেতা দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিলেন। পিতা এবারও উত্তর দিলেন না। নচিকেতা তৃতীয় বারও ঐ প্রশ্ন করিলেন। পিতা তখন রাগ করিয়া উত্তর দিলেন 'মৃত্যুর নিকটে !'

বালক ভাবিতে লাগিলেন 'যমের এমন কী কার্য আছে যাহা তিনি আমাকে দিয়া করাইবেন?'

যাহাই হউক, নচিকেতা যমের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যম সেই সময়ে প্রবাসে গিয়াছিলেন। নচিকেতার অতিথি সৎকার কিছুই হইল না। তিনি তিনদিন যমের গৃহে অভুক্ত অবস্থাতেই থাকিলেন। যম বাড়ীতে ফিরিয়া ইহা জানিতে পারিয়া নচিকেতাকে বলিলেন—

'ব্রাহ্মণ, তুমি নমস্য অতিথি। তুমি তিনরাত্রি আমার গৃহে উপবাসে রহিয়াছ। হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে নমস্কার। আমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার কাছে তিনটি বর প্রার্থনা কর।'

নচিকেতা নিজের বিয়োগে পিতার মন যে, অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রথম বরে যমের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পিতার মনের দুঃখ যেন শান্ত হইয়া যায়, আর যখন তিনি যমের নিকট হইতে ফিরিয়া বাড়ী যাইবেন, তখন পিতা যেন তাঁহাকে চিনিয়া সম্ভাষণ করেন। যম তাঁহাকে 'তথাস্তু' বলিয়া এই বর দিলেন।

নচিকেতা দ্বিতীয় বরের জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন 'স্বর্গলোকে কোনো ভয় নাই। হে যম, আপনি তো সেখানে থাকেন না। সেখানে জরারও ভয় নাই। লোকে সেখানে ক্ষুধা-পিপাসা অতিক্রম করিয়া শোকের অতীত হইয়া আনন্দ করে। যে অগ্নির দ্বারা উপাসনা করিলে এই স্বর্গলোক পাওয়া যায়, আপনি তাহা আমাকে বলুন।'

যম ইহা প্রদান করিয়া তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। নচিকেতা বলিলেন—

'মানুষ মরিলে এই যে একটা সন্দেহ আছে, কেহ-কেহ বলেন সে থাকে, আর কেহ-কেহ বলেন থাকে না। এই উভয়ের মধ্যে ঠিক কী তাহাই আমি আপনার নিকটে জানিতে চাই। ইহাই আমার তৃতীয় বর।'

যম নচিকেতাকে যে গম্ভীর উপদেশ দিতে চান, নচিকেতা তাহার উপযুক্ত পাত্র কি না, ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি তাঁহাকে প্রথমত ঐ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

'নচিকেতা, মানুষের আর কথাই কী, দেবতাদেরও এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহা মোটেই সুগম নহে, বড় সূক্ষ্ম। তাই তুমি অন্য কোনো বর গ্রহণ কর, এটা ছাড়িয়া দাও।'

নচিকেতা বলিলেন 'হে যম, আপনি বলিতেছেন দেবতাদেরও এ বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে, আর ইহা সুগমও নহে। কিন্তু আপনার মত বক্তা তো পাওয়া যায় না। তাই অপর কোনো বরই ইহার সমান নহে।'

যম নচিকেতাকে প্রলোভন দিয়া বলিলেন 'নচিকেতা, তুমি নিজের শতায়ু পুত্র- ও পৌত্র-সমূহ প্রার্থনা কর। প্রার্থনা কর যত বৎসর ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিবে। অথবা ইহার সমান অন্য যদি কিছু মনে কর, প্রার্থনা কর, ধন অথবা চিরজীবন। প্রার্থনা কর মহারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব। সংসারে যে সব কামনা বড় দুর্লভ, তুমি নিজের ইচ্ছামত সে সমস্ত প্রার্থনা কর। রথসমূহে গীত ও বাদ্যের সহিত এই রমণীগণ, আমি ইহাদিগকে দান করিতেছি, ইহারা তোমায় পরিচর্যা করুক। কিন্তু, নচিকেতা, মৃত্যুর প্রশ্ন আমার নিকটে করিও না।'

নচিকেতা বলিলেন 'হে অন্তক, আপনি এই সকলের কথা বলিতেছেন, কিন্তু এ সব তো আজ আছে, কাল নাই। এগুলির উপভোগে ইন্দ্রিয়সমূহ জীর্ণ হইয়া পড়ে। এ জীবন আর কতটুকু? এই যে অশ্ব প্রভৃতি বাহন, এ সব আপনারই থাকুক। বিত্তের দ্বারা মানুষের তৃপ্তি হয় না। তা ছাড়া, আপনার যখন দেখা পাইয়াছি তখন আমার বিত্তলাভ তো হইবেই। আর যতদিন আপনার

প্রভুত্ব আছে, ততদিন বাঁচিয়াও থাকিব। অতএব ঐ বরকেই প্রার্থনা করি, অন্য বর চাই না।'

নচিকেতার কথায় যম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

'দুইটি জিনিস আছে। ইহাদের একটি হইতেছে শ্রেয় (অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদের অধিকতর ভাল হয়), আর অন্যটি হইতেছে প্রেয় (অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদের অধিকতর প্রীতি হয়)। ইহাদের প্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন। ইহারা উভয়েই মানুষের কাছে আসে। তবে যে ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহারই হয় ভাল। আর যে ব্যক্তি প্রেয়কে বরণ করে, সে আসল জিনিস হইতে ভ্রষ্ট হয় (১. ২. ১)।'

যম নচিকেতাকে মরণের কথা বলিতেছেন। কিন্তু মরণের কথা অনেকেরই মনে হয় না। এই সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন (১-২-৬)—

'যে ব্যক্তি মূঢ় ও অসাবধান, যে ধনের মোহে আচ্ছন্ন, তাহার কাছে পরলোক প্রকাশ পায় না। আর যে মনে করে এই (বর্তমান) লোকই আছে, পর লোক নাই, সে বারবার আমার বশে আসিয়া থাকে।'

মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকে। যম সেই আত্মার কথা বলিতেছেন (১. ২. ৭-৮)—

'যাহাকে অনেকে শুনিতেও পায় না, বা শুনিলেও যাহাকে অনেকে জানিতে পারে না, সেই আত্মাকে যিনি বলেন তিনি এক আশ্চর্য ব্যক্তি, আর যিনি তাহাকে লাভ করিতে পারেন তিনি হইতেছেন নিপুণ। কেবল নিপুণ ব্যক্তিরই উপদেশে তাহাকে লাভ করিতে পারা যায়, আর যিনি তাহাকে লাভ করিতে পারেন তিনি হইতেছেন এক আশ্চর্য ব্যক্তি। কোনো নিকৃষ্ট ব্যক্তির উপদেশে তাহাকে ভাল করিয়া জানা যায় না, কেননা লোকে ইহাকে নানাভাবে চিন্তা করিয়া থাকে। কেহ

বলিয়া না দিলে এখানে কোনো উপায় নাই, কেননা ইহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। তর্ক করা এখানে চলে না।'

আত্মা যে কত দুর্জ্ঞেয় যম তাহা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—(১-২-২৩)—

'বেদাধ্যয়নের দ্বারা, মেধা দ্বারা বা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা ইহাকে পাওয়া যায় না, যাঁহাকে ইহা চাহে তাঁহারই নিকট ইহা নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করে।'

আরো বলা হইয়াছে (১-২-২৪)—

'যে ব্যক্তি অসৎ কার্য হইতে নিবৃত্ত নহে, যে শান্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে বিরত) নহে, যে একাগ্রচিত্ত নহে, যাহার মন শান্ত নহে, বিশেষ জ্ঞান থাকিলেও সে তাহাকে পায় না।'

সেই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইতে হইলে যাহা করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে যম বলিয়াছেন (১.৩.৩-৯)—

'মনে কর নিজে তুমি রথী, শরীর তোমার রথ, বুদ্ধি তোমার রজ্জু (বল্গা), ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, (শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি) বিষয়সমূহ হইতেছে (ঐ অশ্বগুলির) চরিয়া বেড়াইবার স্থান, আর যিনি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত থাকেন (অর্থাৎ জীব) তিনি হইতেছেন ভোগকর্তা।'

'যাহার বিজ্ঞান নাই, মন যাহার সংযত নহে, সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত থাকে না। কিন্তু যাহার বিজ্ঞান আছে, এবং মন সর্বদা সংযত, সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হইয়া থাকে। যাহার বিজ্ঞান নাই, যাহার মন অসংযত, এবং যাহার মন অশুচি, সে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (অপর পক্ষে) যাহার বিজ্ঞান আছে, যাহার মন সংযত, এবং যে সর্বদা শুচি, সে সেই পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে যাহা হইতে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।* যে ব্যক্তির বিজ্ঞান

হইতেছে সারথি, আর মন হইতেছে রজ্জু, সে পথের শেষ অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

নিম্নে আমরা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের অনুকূল আর কয়টি কথা বিভিন্ন উপনিষদ্ হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি—

'এই আত্মাকে বেদাধ্যয়নের দ্বারা, মেধা দ্বারা, বা বহু শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারা পাওয়া যায় না; যাঁহাকে ইনি চান তাঁহারই নিকটে নিজের স্বরূপকে প্রকটিত করেন।' ক. উ. ১-২-২৩।

'দুর্বল ব্যক্তি ইহাকে লাভ করিতে পারেন না (মু. উ. ৩-২-৪); কিন্তু সত্য দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা, ও নিত্য ব্রহ্মচর্য দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায়।' মু. উ. ৩-১-৪।

'এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে, এবং যাঁহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।' 'যাহাদের মধ্যে কুটিলতা নাই, মিথ্যা নাই, ছলনা নাই, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই।' প্র. উ. ১৫-১৬।

'তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন ও কর্ম হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার আশ্রয়।' কে.উ.৪-৩২।

'উপনিষদের প্রসিদ্ধ মহা-অস্ত্র ধনুকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপাসনা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত বাণ যোজনা করিবে। অনন্তর তাহা (ঐ ধনু) আকর্ষণ করিয়া, হে সোম্য, লক্ষ্যভূত সেই অক্ষরকেই (অর্থাৎ ব্রহ্মকেই) তদ্গতচিত্তে বিদ্ধ করিবে।'

'এখানে ধনু হইতেছে প্রণব (অর্থাৎ ওঙ্কার), নিজের আত্মাই হইতেছে বাণ, আর সেই ব্রহ্মকেই বলা হয় লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হইয়া তাহা বিদ্ধ করিতে হইবে। (তজ্জন্য) বাণের মত তন্ময় হইতে হইবে।' মু. উ. ২-২-৪,৫।

'যেমন তিলের মধ্যে তেল, দইয়ের মধ্যে ঘি, স্রোতের মধ্যে জল, আর কাঠের মধ্যে আগুন, তেমনি তিনি নিজেরই মধ্যে আত্মাকে জানিতে পারেন, যিনি সত্য ও তপস্যা দ্বারা দেখেন।' শ্বে. উ. ১-১৫।

বলিয়া না দিলে এখানে কোনো উপায় নাই, কেননা ইহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। তর্ক করা এখানে চলে না।'

আত্মা যে কত দুর্জ্ঞেয় যম তাহা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—(১-২-২৩)—

'বেদাধ্যয়নের দ্বারা, মেধা দ্বারা বা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা ইহাকে পাওয়া যায় না, যাঁহাকে ইহা চাহে তাঁহারই নিকট ইহা নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করে।'

আরো বলা হইয়াছে (১-২-২৪)—

'যে ব্যক্তি অসৎ কার্য হইতে নিবৃত্ত নহে, যে শান্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে বিরত) নহে, যে একাগ্রচিত্ত নহে, যাহার মন শান্ত নহে, বিশেষ জ্ঞান থাকিলেও সে তাহাকে পায় না।'

সেই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইতে হইলে যাহা করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে যম বলিয়াছেন (১.৩.৩-৯)—

'মনে কর নিজে তুমি রথী, শরীর তোমার রথ, বুদ্ধি তোমার রজ্জু (বল্গা), ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, (শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি) বিষয়সমূহ হইতেছে (ঐ অশ্বগুলির) চরিয়া বেড়াইবার স্থান, আর যিনি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত থাকেন (অর্থাৎ জীব) তিনি হইতেছেন ভোগকর্তা।'

'যাহার বিজ্ঞান নাই, মন যাহার সংযত নহে, সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত থাকে না। কিন্তু যাহার বিজ্ঞান আছে, এবং মন সর্বদা সংযত, সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হইয়া থাকে। যাহার বিজ্ঞান নাই, যাহার মন অসংযত, এবং যাহার মন অশুচি, সে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (অপর পক্ষে) যাহার বিজ্ঞান আছে, যাহার মন সংযত, এবং যে সর্বদা শুচি, সে সেই পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে যাহা হইতে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির বিজ্ঞান

হইতেছে সারথি, আর মন হইতেছে রজ্জু, সে পথের শেষ অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

নিম্নে আমরা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের অনুকূল আর কয়টি কথা বিভিন্ন উপনিষদ্ হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি—

'এই আত্মাকে বেদাধ্যয়নের দ্বারা, মেধা দ্বারা, বা বহু শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারা পাওয়া যায় না; যাঁহাকে ইনি চান তাঁহারই নিকটে নিজের স্বরূপকে প্রকটিত করেন।' ক. উ. ১-২-২৩।

'দুর্বল ব্যক্তি ইহাকে লাভ করিতে পারেন না (মু. উ. ৩-২-৪); কিন্তু সত্য দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা, ও নিত্য ব্রহ্মচর্য দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায়।' মু. উ. ৩-১-৪।

'এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে, এবং যাঁহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।' 'যাহাদের মধ্যে কুটিলতা নাই, মিথ্যা নাই, ছলনা নাই, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই।' প্র. উ. ১৫-১৬।

'তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন ও কর্ম হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার আশ্রয়।' কে.উ.৪-৩২।

'উপনিষদের প্রসিদ্ধ মহা-অস্ত্র ধনুকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপাসনা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত বাণ যোজনা করিবে। অনন্তর তাহা (ঐ ধনু) আকর্ষণ করিয়া, হে সোম্য, লক্ষ্যভূত সেই অক্ষরকেই (অর্থাৎ ব্রহ্মকেই) তদ্গতচিত্তে বিদ্ধ করিবে।'

'এখানে ধনু হইতেছে প্রণব (অর্থাৎ ওঙ্কার), নিজের আত্মাই হইতেছে বাণ, আর সেই ব্রহ্মকেই বলা হয় লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হইয়া তাহা বিদ্ধ করিতে হইবে। (তজ্জন্য) বাণের মত তন্ময় হইতে হইবে।' মু. উ. ২-২-৪,৫।

'যেমন তিলের মধ্যে তেল, দইয়ের মধ্যে ঘি, স্রোতের মধ্যে জল, আর কাঠের মধ্যে আগুন, তেমনি তিনি নিজেরই মধ্যে আত্মাকে জানিতে পারেন, যিনি সত্য ও তপস্যা দ্বারা দেখেন।' শ্বে. উ. ১-১৫।

'এই যাহা কিছু জগতে রহিয়াছে ঈশ্বরই তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারেন। তিনি যাহা দেন তাহাতেই ভোগ করিবে। ধন কাহার?' ঈ. উ. ১।

'কর্ম করিয়াই এখানে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এইরূপেই তুমি আছ, ইহা হইতে অন্য কোনোরূপে নহে। কর্ম মানবে লিপ্ত হয় না।' ঈ. উ. ২।

'যিনি সমস্ত ভূতকে আত্মার (নিজের) মধ্যে এবং আত্মাকে সমস্ত ভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি তাহাতে (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না।' ঈ. উ. ৬।

'যখন যে জ্ঞানীর নিকটে সমস্ত ভূত আত্মাই হয়, এবং তিনি দেখিতে পান যে তাহারা একই, তখন তাঁহার মোহ কী, আর শোকই বা কী?' ঈ. উ. ৭।

'তাঁহারা অতিনিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করেন যাঁহারা অবিদ্যা (অর্থাৎ কর্মের) উপাসনা করেন, আর তাঁহারা যেন তাহা হইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন যাঁহারা বিদ্যায় রত থাকেন।' ঈ. উ. ৯।

'যাহারা আমাদের নিকট তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই বিদ্বান্‌দের কাছে শুনিয়াছি যে, বিদ্যার ফল অন্য, আর অবিদ্যার ফল অন্য।' ঈ. উ. ১০।

'যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই একসঙ্গে উপাসনীয় বলিয়া মনে করেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ করিয়া থাকেন।' ঈ. উ. ১১।

'যখন হৃদয়ের সমস্ত কামনা চলিয়া যায়, মরণশীল মানব তখন অমর হয়, এবং তখনই সে ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকে।' ক. উ. ২-৬-১০।

'ইনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা। অগ্নি (অর্থাৎ উজ্জ্বল দ্যুলোক)

ইহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য ইহার চক্ষু, দিক্‌সমূহ ইহার কর্ণ, বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব বক্ষঃস্থল, এবং পৃথিবী হইতেছে ইহার চরণ।' মু. ২-১-৪।

'সমুদ্র- ও পর্বত-সমূহ ইহা হইতেই হইয়াছে, বিবিধ নদীসমূহ ইহা হইতেই প্রবাহিত, ইহা হইতেই সমস্ত ওষধি ও রস, যাহাতে সমস্ত ভূতের সহিত এই অন্তরাত্মা রহিয়াছেন।' মু. উ. ২-১-৯।

'যিনি এক এবং যাঁহার কোনো বর্ণ নাই, যিনি নিগূঢ় প্রয়োজনে বহুবিধ শক্তির যোগে বহু পদার্থকে সৃষ্টি করেন, আদিতে এই বিশ্ব যাঁহাতে থাকে এবং শেষে যাঁহাতে ইহা লীন হয়, তিনিই দেব, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন।' শ্বে. ৩-১।

'অন্ধকারের পরে স্থিত ও সূর্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এই সেই মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকেই জানিয়া লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে, প্রস্থান করিবার অন্য পথ নাই।' শ্বে. ৩.৮।'

'মানবেরা যখন চামড়ার মত এই আকাশকে গুটাইয়া লইতে পারিবে তখনই সেই দেবকে না জানিয়া তাহাদের দুঃখের অবসান হইবে।' শ্বে. উ. ৬. ২০।

'যাঁহা হইতে আর কিছু উৎকৃষ্ট নাই, যাঁহা হইতে আর কিছু ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর নাই, যিনি দ্যুলোকে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই পুরুষই এই সমস্তকে পূর্ণ করিয়া আছেন।' শ্বে. উ. ৬-৯।

'(*সেই*) দেবের প্রতি যাঁহার পরা ভক্তি আছে, এবং যেমন তাঁহার প্রতি তেমনি গুরুর প্রতি, সেই মহাত্মারই নিকট কহিলে এই সমস্ত কথার অর্থ ফুটিয়া উঠে।' শ্বে. উ. ৬-২৩।

ওঁ তৎ সৎ।

সাঙ্কেতিক অক্ষর

ঈ. উ.	ঈশোপনিষদ্
ঐ. উ.	ঐতরেয় উপনিষদ্
ক. উ.	কঠ উপনিষদ্
কে. উ.	কেন উপনিষদ্
ছা. উ.	ছান্দোগ্য উপনিষদ্
তৈ. উ.	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্
প্র. উ.	প্রশ্ন উপনিষদ্
বৃ. উ.	বৃহদারণ্যক উপনিষদ্
মু. উ.	মুণ্ডক উপনিষদ্
শ্বে. উ.	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ . অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় . মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা . শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি শিল্প . ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ · রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ